২০০৪

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্

আহ্‌মদী বুলেটিন

(আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের তা'লীম-তরবিয়তের উদ্দেশ্যে) ❒ ১৫ জুলাই, ২০০৪

সম্পাদকীয়

অহংকার পতনের মূল

বিদগ্ধ জ্ঞানীজনেরা বলেছেন, অহংকার পতনের মূল। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট করার জন্যে অহংকারের মত বদ্ গুণ আর নেই। অহংকার আত্মম্ভরিতা, গর্ব-এক কথায় 'তাকাব্বরী' আল্লাহ্‌র নিকট খুবই অপসন্দনীয়। একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন খড়ের এক গাদাকে নিমিষে ভস্মীভূত করে দিতে পারে, তেমনই সামান্য পরিমাণ তাকাব্বরী বা অহংকার মানুষের বহুদিনের সঞ্চিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অমূল্য ভান্ডারকে নিঃস্ব ও রিক্ত করে দিতে পারে; পারে সমূলে ধ্বংস করে দিতে।

অহংকার করা কেবল সেই মহান আল্লাহ্‌রই সাজে যিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও সকল গুণের আধার। তিনি তাঁর কাজের জন্যে কাউকে জবাব-দিহি করেন না বরং অন্যান্য সকলে তাদের কাজের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। এক হাদীসে এসেছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- "ইয্‌যত ও সম্মান আল্লাহ্‌র পোষাক, অহংকার আল্লাহ্‌র চাদর; তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) বলেছেন, যে কেউ আমার কাছ থেকে এ দুটোকে কেড়ে নিতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব" (মুসলিম কিতাবুল্ বিরর ওয়াস্ সিলাহ)। সুতরাং আমাদের কখনও অহংকার, গর্ব বা আত্মম্ভরিতা দেখানো উচিত নয়। কেননা, বান্দা হয়ে আমাদের এটা সাজে না। ইবলীসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে আল্লাহ্‌কে অমান্য করেনি বটে, তবে সে কেবল অহংকারের বশীভূত হয়েই মাটির তৈরী হযরত আদমকে আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। কেননা, তার গর্ব ছিল- সে আগুনের তৈরী। তাই সে কাফির বা অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, 'সকল পাপের মূলে রয়েছে ৩টি জিনিস। অহংকার থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কারণ অহংকারই হযরত আদমকে সিজদা করা থেকে ইবলীসকে বিরত রেখেছিল। দ্বিতীয়ত লোভ সম্বরণ কর। কেননা, হযরত আদম লোভের বশবর্তী হয়েই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তৃতীয়ত হিংসা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কারণ হিংসার কারণেই হযরত আদমের দু' পুত্রের একজন অন্যজনকে হত্যা করেছিল" (কেশরিয়া, বাব হাসাদ)।

প্রত্যেক যুগে অহংকারই মানুষকে সমাগত নবী-রসূল, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, যুগ-ইমাম এবং খলীফার আনুগত্য করা থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে। আজকের যুগে সারা দুনিয়ার প্রভুত্ব লাভ করার জন্যে ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের ব্যগ্রতা-ও অহংকারেরই কারণে। কোন কোন ব্যক্তির অহংকারের কারণে সারা বিশ্বে জাহান্নামের আযাব নেমে আসে। নিরীহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ও জাতির ওপরে অহংকাররূপ দৈত্য জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে। মোটকথা অহংকার মানুষকে আল্লাহ্‌র বিপরীতে দাঁড় করিয়ে ছাড়ে। যারা এহেন কাজ করে তাদেরকে যেন খোদায় পরিণত করে দেয়। হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যার মাঝে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে আগুনে প্রবেশ করবে না" (ইবনে মাজাহ্)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও তাঁর জামাতকে অহংকাররূপ বিভীষিকাময় আত্মঘাতী মৃত্যু থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে বলেছেন-

"আমি আমার জামাতকে নসীহত করছি, অহংকার হতে নিজেকে রক্ষা কর। কারণ, এটি আমাদের খোদায়ে যুলজালালের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা হয়তো বুঝতে পার না অহংকার কী? অতএব আমার কাছ থেকে বুঝে নাও (অহংকার কী?)। আমি খোদার রূহ (রূহুল কুদুস-এর সাহায্য) থেকে বলছি, প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের এক ভাইকে এজন্যে হেয় ও তুচ্ছ মনে করে যে, সে জ্ঞান-বুদ্ধি বা প্রযুক্তি বিদ্যায় তার চেয়ে অধিক পারদর্শী, সে অহংকারী কারণ সে আল্লাহ্‌তাআলাকে বিদ্যা-বুদ্ধির উৎস মনে করে না। আর নিজেকে কিছু একটা মনে করে। অথচ আল্লাহ্‌তাআলা তাকে উন্মাদ করে দিতে পারেন এবং তাঁর ভাই যাকে সে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করে তাকে তার চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে দিতে পারেন ... সুতরাং তোমরা চেষ্টা কর যেন তোমাদের মাঝে অহংকারের সামান্য অংশও না থাকে নচেৎ তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে মুক্তি পাবে না। তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড় ও যে পরিমাণ ভালবাসা পৃথিবীতে কারো সাথে করা সম্ভব সে পরিমাণ তাঁকে ভালবাস আর পৃথিবীতে কোন মানুষকে যতটা ভয় পেতে পার ততটা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তুমি পবিত্র হৃদয়সম্পন্ন হয়ে যাও, পবিত্র নিয়্যতের লোক হয়ে যাও, গরীব, মিসকীন ও নিষ্কন্টক হয়ে যাও যেন তোমার প্রতি দয়া করা হয়" (নযূলে মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৮ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০২)।

❑ ১৫ জুলাই, ২০০৪

বিষয় - সূচী	পৃষ্ঠা নং
● কুরআন শরীফ	৩
● হাদীস শরীফ	৩
● অমৃতবাণী	৪
● জুমুআর খুতবা ঃ ইমামের আনুগত্য সর্বাবস্থায় জরুরী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	৫-৯
● জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্‌তাআলার 'খবীর' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	১০-১৪
● ঐশী বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান ও সত্য হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	১৫
● আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ, লন্ডন	১৬-১৮
● আমার স্মৃতিতে তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত	১৯
● ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসীদের সীমা	২০
● কুরআনের একটি আয়াত এবং মাওলানাদের নীরবতা	২১
● দোয়ার বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণ	২২-২৪
● হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফরের প্রতিবেদন	২৫-২৭
● সংবাদ	২৮-৩২

প্রচ্ছদ ঃ কানাডা জামাতের ২৮তম সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)।

ছবি ঃ জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী সৌজন্যে

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ আন্‌ফাল- ৮

৬৩। এবং তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চাইলে মনে রাখবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মুমিনদের মাধ্যমে তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

৬৪। এবং তিনিই তাদের হৃদয়কে পরস্পর (ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে) বেঁধে দিয়েছেন, পৃথিবীর সব কিছু ব্যয় করলেও তুমি তাদের (হৃদয়)-কে এভাবে (প্রীতির বন্ধনে) বাঁধতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ্ই তাদের (হৃদয়)-কে পরস্পর বেঁধে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৬৫। হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্যও যথেষ্ট।

৬৬। হে নবী! তুমি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাক; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন[১১৪১] দৃঢ়চেতা থাকলে তারা দু'শ জনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে আর তোমাদের মধ্যে একশ'জন (দৃঢ়চেতা) থাকলে অস্বীকারকারীদের এক হাজার জনের বিরুদ্ধে তারা জয়ী হবে, কেননা তারা এমন লোক যারা বুঝে না।[১১৪২]

৬৭। আপাতত আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লাঘব করে দিয়েছেন। কেননা তিনি জানেন, তোমাদের মাঝে (এখনও) কিছু দুর্বলতা আছে। অতএব, তোমাদের মাঝে একশ' জন দৃঢ়চেতা থাকলে তারা দু'শ জনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, আর তোমাদের মাঝে এক হাজার জন (দৃঢ়চেতা) থাকলে তারা আল্লাহ্‌র অনুমোদনক্রমে দু'হাজার জনের[১১৪৩] বিরুদ্ধে জয়ী হবে। এবং আল্লাহ্ দৃঢ়চেতাদের সাথে আছেন।

১১৪১। এ আয়াত থেকে জানা যায়, যুদ্ধের নিমিত্তে ছোট ছোট দল গঠন করতে হলে এর প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে ২০ জন থাকতে হবে।

১১৪২। কারণ তারা ভাড়াটে সৈনিক এবং তারা যে উদ্দেশ্যে লড়াই করে তার সত্যতা অনুধাবন করে না, তারা এর জন্য আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করে না। অথবা এ কথার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, তাদের কোন উচ্চতর আদর্শ নেই যার অনুসরণ তারা করতে চায়।

১১৪৩। এ আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতটিকে রদ করা বুঝায় না। দু'টি আয়াত মুসলমান সম্প্রদায়ের দুই ভিন্ন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে। শুরুতে তারা রণ-শৈলীতে দুর্বল, নগণ্যভাবে সজ্জিত এবং অদক্ষ ছিল। এমন দুর্বল অবস্থায় তারা কেবল তাদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেই কৃতকার্যতার সঙ্গে লড়তে পারতো। কিন্তু কালক্রমে তাদের সামাজিক অবস্থা, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং সামরিক সম্ভাবনা প্রভুত উন্নত হওয়ার ফলে দশ গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুদলকে পরাজিত করতে সক্ষম ছিল। বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধগুলোতে উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যার অসমতা ক্রমশঃই বেড়ে চলছিল, তা-সত্ত্বেও মুসলমান নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সফলতার সঙ্গে বজায় রেখেছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধ পর্যন্ত ৬০,০০০ মুসলমান সৈন্য শত্রুর ১০ লক্ষাধিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছিল।

১১৪৪। এ আয়াত সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করে যে, রীতিমত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে শত্রু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হলে বন্দী রাখা সমীচীন নয়। এই অবস্থা দাস-প্রথার মূলোৎপাটন করেছে। ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং পরাজিত হয়, শুধু কেবল মাত্র তাদেরকেই কয়েদ করা যেতে পারে।

হাদীস শরীফ

মুসলিম উম্মাহ্‌র অধঃপতন সম্বন্ধে নবী করীম (সঃ)-এর বিভিন্ন হাদীস ও আশার বাণী

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টি জীবের মাঝে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মাঝ থেকে ফিৎসা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মাঝেই তা ফিরে যাবে" (বায়হাকী, মিশকাত)।

"হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর হতে বর্ণিত হয়েছে– হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আমার উম্মতের ওপরও সে সকল অবস্থা আসবে যেরূপ বনী ইসরাঈলের ওপর এসেছিল। উভয়ের মাঝে এক জুতার সাথে অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে, এমন কি তাদের মধ্য হতে কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজ মাতার নিকট গমন করে থাকে তদ্রূপ আমার উম্মতের মাঝেও এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যে সেরূপই করবে। বনী ইসরাঈলতো ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবলমাত্র এক ফিরকাহ্ ব্যতীত।' তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে ফিরকাহ্ কোন্‌টি?' তিনি বললেন, 'আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকাহ্ থাকবে' (তিরমিযী ঃ কিতাবুল ঈমান)।

"ধর্মজ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়ত (আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা) প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি কাটাকাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মাঝে ঈমানদারের অভাব হবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে মানুষ গৌরব অনুভব করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, দলের সর্দার ফাসেক (দুর্নীতিপরায়ণ) হবে, জাতির নীচ লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকার প্রাধান্য হবে। উট্‌নী বেকার হবে; এতে চড়ে মানুষ দূরদেশে যাবে না' (বুখারী, মুসলিম)।

হযরত নু'মান বিন্ বশীর হুযায়ফা বর্ণনা করেছেন, 'হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তাআলা চাইবেন; অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন; অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন; অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা

উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন; অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতি (অর্থাৎ মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম-এর আগমনের পর) পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর হযরত আকদস (সঃ) নীরব হয়ে গেলেন" (আহমদ-বাইহাকী)।

"কেমন করে ধ্বংস হবে সে উম্মত যার প্রথম ভাগে আমি, মধ্যভাগে মাহ্দী ও শেষভাগে মসীহ্ থাকবেন" (মিশকাত)?

"তোমাদের মাঝে যারা (রূহানীভাবে) জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা-ইবনে মরিয়মকে ন্যায়-বিচারক ইমাম-মাহ্দীরূপে" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

"ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে আর কোন মাহ্দী নেই" (ইবনে মাজাহ্)।

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

ঈসা ইবনে মরিয়ম কখনও আকাশ থেকে অবতরণ করবেন না

"এখন দেখ, খোদা স্বীয় হুজ্জত (দলীল প্রমাণের সাহায্যে কোন কিছুর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা-অনুবাদক) তোমাদের ওপর এভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, আমার দাবীর অনুকূলে হাজার হাজার দলীল-প্রমাণ কায়েম করে তোমাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা চিন্তা কর যে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে এ জামাতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি কোন্ পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং কি পরিমাণ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তোমরা আমার পূর্বের জীবনের ওপর কোন দোষারোপ করতে মিথ্যা বা প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারবে না, যাতে তোমরা এ ধারণা করতে পার যে, যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই মিথ্যা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত এটাও সে মিথ্যা বলেছে। তোমাদের মাঝে কে আছ, যে আমার জীবনে দোষারোপ করতে পার? সুতরাং এটা খোদার ফযল যে, তিনি শুরু হতেই আমাকে তাক্ওয়ার (খোদা-ভীতির) ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। যারা চিন্তা করে তাদের জন্যে এটা একটি দলীল।

এতদ্ব্যতীত আমার খোদা ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে সত্যবাদীরূপে মানার জন্য যে পরিমাণ দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন ছিল এর সবটাই তোমাদের জন্যে যোগান দিয়েছেন। আমার জন্য আকাশ হতে আরম্ভ করে পৃথিবী পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং সকল নবী আদি হতে অদ্যবধি আমার সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়টি যদি মানুষের হত তাহলে এতে এ বিপুল পরিমাণ দলীল-প্রমাণ কখনো একত্র হ'ত না।'

'স্মরণ রেখ, কেউ আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তারা সকলে মরবে, কিন্তু তাদের মাঝ থেকে কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তাদের মাঝ থেকেও কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর সন্তানদের সন্তানেরা মরবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশের প্রাধান্যের যুগও অতিবাহিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অবস্থা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে; কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) এখনও আকাশ হ'তে অবতীর্ণ হলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে। অতঃপর আজ হ'তে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীরা- কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সবাই অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা সে বীজ বপন করা হয়েছে। এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।" (তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতায়েন, পৃষ্ঠা ৯৬, ১০০-১০১, বাংলা সংস্করণ)

লেখা আহ্বান

সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে জানান যাচ্ছে, আহমদী বুলেটিনে নিয়মিত লেখা পাঠিয়ে জামাতের এই রূহানী খাদ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করুন। আপনাদের জ্ঞানচর্চার একটি অনন্য সাধারণ মাধ্যম করে তুলুন এই পত্রিকাটিকে। হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ 'সুলতানুল কলম' বা লেখনী সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেছেন। কোন সেনা প্রধানের পিছনে যেমন সমস্ত সৈন্যবাহিনী অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে- ঠিক তেমনি এই রূহানী সিপাহ্ সালারের পিছনে আমাদেরকেও কলম (জ্ঞান) নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন সেনাছাউনীতে সৈন্যরা কোন পদের অস্ত্রকে সার্ভিসিং করে, ঠিক তেমনি আমাদের জ্ঞান-চর্চা, অনুশীলন প্রয়োগ ও আমলের মাধ্যমে সর্বদা উজ্জীবিত রাখা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। প্রবন্ধ, কবিতা, পুস্তক-আলোচনা, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাদের পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা নিয়মিতভাবে আহমদী বুলেটিনের জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন। ❑লেখা অবশ্যই ফুলস্কেপ সাদা কাগজে এবং কাগজের এক পাশে স্পষ্টাক্ষরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ❑পত্রিকায় ছাপার জন্য লেখা মনোনয়ন ও বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত করেন। ❑অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। ❑তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করলে অবশ্যই সূত্র উল্লেখ করবেন। ❑পত্রিকার প্রয়োজনে বা মৌলিক নীতিগত কারণে লেখা সংক্ষেপিত বা ভাষাগত পরিবর্তন করা যেতে পারে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এলমী ময়দানে জেহাদ করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

সেক্রেটারী ইশাআত

ইমামের আনুগত্য সর্বাবস্থায় জরুরী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা বয়াতের একটি শর্ত। সচ্ছলতা হোক বা অসচ্ছল অবস্থা হোক আমীরের এবং ইমামের আনুগত্য একান্ত জরুরী।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

বয়াতের দশটি শর্তের উপর যে আলোচনা শুরু করেছিলাম আজ তার দশম শর্ত বা শেষ শর্তের উপর আলোচনা করব। দশম শর্তটি নিম্নরূপ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সমস্ত আদেশ পালন করবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর] সাথে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

এ শর্তের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে, বয়াতের মাধ্যমে এই নেযামে শামীল হয়ে একজন হযরত সাহেবের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। কারণ প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। কিন্তু এখানে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করা হয়েছে তা অন্য সব সম্পর্কের উর্ধ্বে। কারণ, এখানে সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে না বরং তোমরা অঙ্গীকার করছ যে, আমরা আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে গ্রহণ করছি। অতএব, এ সম্পর্ক আল্লাহ্‌র খাতিরে কায়েম হচ্ছে। আল্লাহ্‌র ধর্মের বিজয় বা বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য এ সম্পর্ক কায়েম করা হচ্ছে। সুতরাং এ সম্পর্ক উক্ত অঙ্গীকারের সাথে সাথে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যখন পুণ্যকর্মে আনুগত্যের অঙ্গীকার কর তখন একে আমরণ পূরণ করে যাও। এটা মনে রেখ যে, এ সম্পর্ক যেন প্রথম স্থানেই থেমে না থাকে। বরং উত্তরোত্তর দৃঢ়তা এবং পরিপক্কতা লাভ করতে থাকে। এ সম্পর্ক যেন এতটা পূর্ণতা ও দৃঢ়তা লাভ করে যে, এর তুলনায় অন্যান্য সব সম্পর্ক খুব দূর্বল মনে হয়। এ সম্পর্ক এতটাই শক্তিশালী হতে হবে যে, এর তুলনায় অন্য সম্পর্ক মূল্যহীন বলে মনে হবে। এরপর বলেছেন ঃ

কোন কোন মনে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের মাঝে এমন হয় যে, কখনও নাও- কখনও দাও, কখনও মান্য কর- কখনও অমান্য কর। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, এখানে যে সম্পর্ক (ভ্রাতৃত্বের সাথে সাথে) এ সম্পর্ক তো মালিক ও চাকরের সম্পর্ক বা মনিব ও দাসের সম্পর্কও বটে। বরং এর চেয়েও বেশি। তুমি এখানে বিনাবাক্যে আনুগত্য করবে। কখনও বলবে না যে, একাজ আজ না কাল করব, এখন করতে পারব না।' যখনই তুমি বয়াত করেছ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের নেযামের মধ্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছ, তখনই তুমি তোমার সব কিছু হযরত মসীহ্ মাওউদকে দিয়ে দিয়েছ। এখন তুমি কেবল তাঁর আনুগত্য করে যাবে। তাঁর দেয়া শিক্ষানুযায়ী কাজ করবে। তারপর এখানে খিলাফতের নেযাম কায়েম আছে। সুতরাং তুমি যুগ খলীফার নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহকে মেনে চলবে। কিন্তু তাই বলে একথা ভাবা যাবেনা যে, চাকর বা দাস অনেক সময় বাধ্য হয়ে আনুগত্য করে। কাজ করতে বাধ্য-তাই সে করে। কখনও কখনও চাকর আপন মনে বিড়-বিড় করতে থাকে। স্মরণ রাখবে যে, এখানে তা নয়। এখানে অবশ্যই খাদেম বা সেবকের অবস্থান। কিন্তু এর কিছু উর্ধ্বে থেকে কাজ করতে হবে। এখানে তো আল্লাহ্‌র খাতিরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে আল্লাহ্‌র খাতিরে আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা! এবং কুরবানীর (ত্যাগ স্বীকারের) প্রতিজ্ঞা। কুরবানীর পুণ্য বা পুরস্কার তখন পাওয়া যায় যখন সে কুরবানী সানন্দে পেশ করা হয়, খুশী মনে পেশ করা হয়। এটি এমন একটি শর্ত যে, এর উপর যতবেশি কেউ চিন্তা করবে তত বেশি-বেশি সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভালবাসার সাগরে ডুবতে থাকবে এবং নিজকে জামাতের নেযামের আনুগত্যকারী হিসাবে জানবে।

অনেকে অনেক সময় "পুণ্যময় নির্দেশ বা পুণ্যময় সিদ্ধান্ত" এর বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে নিজেই নেযামের গন্ডির বাইরে যেতে থাকে। অন্যদের কেউ নষ্ট করতে থাকে। পরিবেশকে দূষিত করতে থাকে। তাদের মনে রাখা উচিত যে, তারা নিজেরাই যেন পুণ্যময় নির্দেশ বা পুণ্যময় সিদ্ধান্তের সংজ্ঞা রচনা না করে। যে সমস্ত আদেশ বা নির্দেশ সরাসরি আল্লাহ্‌তাআলা এবং শরীয়তের আদেশের বিপরীত সেগুলো পুণ্যময় নির্দেশের আওতার বাইরে। হাদীস থেকে একথাই প্রমাণ হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন একবার আঁ-হযরত (সঃ) একজনকে সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়ে একটি সৈন্যবাহিনীকে বাইরে পাঠালেন। সকলকে তার কথা শুনতে ও পালন করতে বললেন। সেই সেনা প্রধান রাস্তায় একদিন আগুন জ্বালিয়ে সৈন্যদের বললেন, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। কিছু লোক তার কথা মানলেন না যে, আমরা তো আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমান হয়েছি। কিন্তু কয়েকজন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হলেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে যখন ঘটনা জানানো হল আঁ হযরত (সঃ) বললেন, তারা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে তারা চিরদিন আগুনেই বসবাস করত। হুযূর (সঃ) আরো বললেন, পুণ্য কর্মের আনুগত্য ফরয, শরীয়তবিরোধী আদেশ পালন করা ফরয নয়।" (সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)

আলোচিত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আদেশ অমান্য করার সিদ্ধান্তটিও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না। কিছু লোক তো আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কারণ তারা জানতেন যে, আমীরের আদেশ মান্য করা যেকোন অবস্থায় জরুরী। কিন্তু আরো কিছু সাহাবা যারা শরীয়তের জ্ঞান বেশি রাখতেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে বেশি সময় অতিবাহিত করে বেশি বরকত লাভ করেছিলেন, তারা অস্বীকার করলেন। পরামর্শের পরেই তারা অস্বীকার করলেন। কারণ আত্মহনন স্পষ্টতই ইসলামে নিষিদ্ধ বা হারাম। প্রাথমিক যুগে অনেক কিছুই সবার জন্য স্পষ্ট ছিল না। উপরোক্ত ঘটনার পর আঁ হযরত (সঃ) স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, পুণ্যকর্ম বা ন্যায়সঙ্গত কর্ম কি তা বোঝার উপায় কি? আমি এখানে বলে দিতে চাই, আজকালও কেউ কেউ এমনটি মনে করেন। অমুক ব্যক্তি তো খুব ভালভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন কিন্তু তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য

একজনকে দায়িত্ব দেয়া হল কেন? জামাতের নেযাম বা খলীফা সাহেব ঠিক করেননি। (তারা বলতে চান) যেমন এ সিদ্ধান্তটি ন্যায়সঙ্গত হয়নি। তারা যেহেতু কিছু করতে পারছেন না অতএব, তারা বুঝে নিলেন যে, এটি সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে, এটি ঠিক হয়নি। অতএত, তাদের এ অধিকারও হয়ে গেছে যে, তারা এখানে-সেখানে বলে বেড়াতে পারেন। প্রথম কথা এই যে, এখানে-সেখানে বলে বেড়ানোর অধিকার তাদের নেই।

এ বিষয়ে ইতিপূর্বেও আমি বিস্তারিত বলেছি। তোমাদের কাজ আনুগত্য করে যাওয়া। আনুগত্যের মাপকাঠি কি তা আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর হাদীসের আলোকে স্পষ্ট করে দেব। হযরত খালেদ বিন ওলীদের ঘটনা সব সময় সামনে রাখা উচিত। এক যুদ্ধের সময় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত খালেদ বিন ওলীদ থেকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে হযরত আবূ ওবায়দা (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওলীদ খুব সুন্দরভাবে কর্তব্য পালন করছেন দেখে হযরত আবূ ওবায়দা হযরত খালেদ থেকে দায়িত্ব নিজ হাতে নিলেন না। কিন্তু খালেদ বিন ওলীদ যখন জানতে পারলেন তখন তিনি সাথে সাথে হযরত আবূ ওবায়দার নিকট গিয়ে বললেন, 'যুগ খলীফার আদেশ, আপনি শীঘ্রই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।' আমি সামান্যও দ্বিধা করব না আপনার অধীনে কাজ করতে। যেমন আমি প্রধান হয়েও কাজ করেছি তেমনই অধীনস্ত হয়েও কাজ করতে থাকব।" এটা হচ্ছে আনুগত্যের মাপকাঠি। কোন ব্যক্তি যার মতিভ্রম ঘটেছে সে হয়ত বলতে পারে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত গায়ের মা'রুফ বা পুণ্যময় ছিল না– ন্যায় সঙ্গত ছিল না। কিন্তু একথা বলা সঠিক হবেনা। আমরা তো ঐ সময়ের সঠিক অবস্থা কি ছিল জানি না যে, কেন হযরত উমর (রাঃ) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয় ভাল জানতেন। কিন্তু এতে শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু আমরা দেখি না। এরপর দেখুন আল্লাহ্তাআলা হযরত উমর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে কিভাবে বরকতপূর্ণ করেছেন। যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। অথচ এমন কঠিন সময়ও এসেছে যখন এক এক মুসলমানের বিপরীতে শত শত শত্রু সংখ্যা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে তাঁর ইমাম (সাঃ)-এর দাসত্বের মধ্য দিয়ে– এমন দাসত্ব বা আনুগত্য যার কোন তুলনা নেই; বিচারক ও ন্যায়-বিচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে (হাকামান আদালান)। তাই এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আনুগত্য এবং তাঁর ভালবাসার মাধ্যমেই হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও ভালবাসার দাবী করা যায়। এরপর আঁ-হযরত (সঃ)-এর আনুগত্যের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্র ভালবাসার দাবী করা যায়। যেমন, আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ

"তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমি একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণে- নিজের কোন যোগ্যতার বলে নয়, এ নেয়ামত লাভ করেছি। যা আমার মাঝে প্রদান করা হয়েছে তা পূর্ববর্তী নবীগণের মাঝেও প্রদান করা হয়েছিল। আমার জন্য এ নেয়ামত লাভ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না যদি আমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ না করতাম। আমি এ বিষয়ে সত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখি এবং আমি জানি যে, কোন মানুষ আঁ হযরত (সঃ)-এর আনুগত্য ব্যতীত খোদা পর্যন্ত পৌছতে পারে না আর না কামেল মা'রেফত (প্রকৃত ও পূর্ণ ঐশী জ্ঞান) লাভ করতে পারে। আমি এখানে একথাও বলে দিতে চাই যে, সেটি কী জিনিস যা আঁ হযরত (সঃ)-এর আনুগত্যের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়। অতএব, স্মরণ রেখ, সেটি হচ্ছে কালবে সেলিম [পরিপূর্ণ শান্তিপ্রাপ্ত হৃদয়] যার মধ্য থেকে পৃথিবীর সকল মোহ বা আকর্ষণ বা ভালবাসা বের করে তা খালি করে দেয়া হয়েছে এবং সেই হৃদয় কেবলমাত্র চিরস্থায়ী শান্তি, এমন শান্তি যা কখনও শেষ হবে না, এমন শান্তি ও স্বাদের আকাঙ্ক্ষা করে (অন্য কোন স্বাদ সে লাভ করতে চায়না) এরপর সে এক প্রকার অত্যন্ত পরিষ্কার অতি স্বচ্ছ এবং আল্লাহ্র পরিপূর্ণ ভালবাসা লাভ করে, কারণ তার হৃদয় কাল্বে সেলিম হয়ে গেছে। এ সমস্ত নেয়ামত কেবলমাত্র আঁ হযরত (সঃ)-এর আনুগত্যের কল্যাণে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য কর, (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২) যেন খোদাও তোমাদের সত্যকে ভালবাসেন।" বরং একতরফা ভালবাসার দাবী পুরোপুরি মিথ্যা একটা আস্ফালন। মানুষ যদি প্রকৃতই আল্লাহ্কে ভালবাসেন তাহলে আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসেন। (আল্লাহ্ যখন কাউকে ভালবাসেন) তখন পৃথিবীতে তার কুবলিয়ত (গ্রহণযোগ্যতা) ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং হাজার হাজার মানুষের অন্তরে তার প্রতি পবিত্র ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তাকে এক প্রকার আকর্ষণ শক্তি প্রদান করা হয় এবং তাকে একটি নূর প্রদান করা হয়, যা সর্বদা তার সাথে থাকে। যখন একজন মানুষ আল্লাহ্কে খাঁটি অন্তরে ভালবাসে এবং পৃথিবীতে সবকিছুর বিপরীতে শুধুমাত্র আল্লাহ্কে আপন করে নেয় এবং তার অন্তরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই কোন সম্মান ও মর্যাদা বাকী থাকে না। বরং সে অন্য সবকিছুকে একটা মৃত পোকার চেয়েও কম মূল্য দেয়। তখন খোদাতাআলা তার অন্তরকে দেখেন এবং একটি ভারী ঐশী তাজাল্লী (ঐশী বিকাশ) সহ তার অন্তরে নাযেল হন বা অবতরণ করেন; যেমন একটি স্বচ্ছ পরিষ্কার ঝকঝকে আয়নাকে যদি সূর্যের সামনে রাখা হয়, সূর্যের আলো এর উপর প্রতিফলিত হয় এমনই। যেমন রূপকভাবে বলা যায় যে, আকাশের সূর্য সেই আয়নার মাঝেও আছে। অনুরূপভাবে খোদাতাআলাও এমন অন্তরে নেমে আসেন এবং এটাকে নিজের আরশ বানিয়ে নেন। এটাই সেই নির্দেশ যেজন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (হাকীকাতুল ওহী- পৃষ্ঠা ৬২)

সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যে ভালবাসা ছিল তার জন্য আল্লাহ্তাআলা তার অন্তরকে নিজের আরশ বানিয়েছিলেন। [যার যেমন যোগ্যতা তদানুসারে আগামীতেও (খোদা) মানব অন্তরে অবতীর্ণ হতে থাকবেন।] কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে ভালবাসার দাবী, আনুগত্যের দাবী আগামীতে তখনই সত্য প্রমাণিত হবে যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান (মসীহ্ মাওউদ)-এর সাথে ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। এজন্যই হযরত (আঃ) বলছেন, অন্য সকল সম্পর্কের চেয়ে বেশি দৃঢ় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক যদি আমার সাথে স্থাপন কর, তাহলে এভাবে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে তোমার আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং আল্লাহ্তাআলার ভালবাসা লাভ হবে। একথা হযরত মাহ্দী (আঃ) নিজ থেকে বলেননি। বরং আঁ-হযরত (সঃ) স্বয়ং একথা আমাদেরকে বলেছেন। যেমন হাদীস দেখুন। হুযূর (সঃ) বলছেন ঃ

"তোমরা যদি ইমাম মাহ্দী এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগ পাও তাহলে যদি তোমাদেরকে হামাগুড়ি দিয়েও তাঁর কাছে যেতে হয় (তবুও গিয়ে) তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌছাবে।" এতবড় জোড়ালো নির্দেশ, এত কষ্ট করে যেতে হবে এবং সালাম বলতে হবে। এর

মাঝে রহস্য কী? কি গোপন তত্ত্ব রয়েছে? রহস্য এটাই যে, সে আমার প্রিয় এবং আমিও তার প্রিয়। সুতরাং এটিই তো নিয়ম যে, কোন প্রিয়জনের কাছে তার প্রিয়জনের মাধ্যমেই তো যাওয়া হয় বা যাওয়া যায়। অতএব, তোমরা যদি আমার আনুগত্য করতে চাও তাহলে মসীহ্ মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আনুগত্য কর। তাঁকে ইমাম হিসাবে মেনে নাও তাঁর জামাতে শামিল হও। তাইতো অপর একটি রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে, 'আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "সাবধান থাক, আমার এবং ঈসা ইবনে মরিয়মের (মসীহ্ মাওউদ) মাঝখানে (মধ্যবর্তী সময়ে) কোন নবী বা রসূল আসবে না।" আরো জেনে রাখ, সে আমার উম্মতে আমার খলীফা হবে। অবশ্যই সে দজ্জালকে হত্যা করবে। ক্রুশ মতবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে এবং জিযিয়ার প্রচলন শেষ করে দিবে" (অর্থাৎ তার যুগে অস্ত্রের যুদ্ধ না হওয়ার কারণে এ প্রথা বাকী থাকবে না)।

"স্মরণ রেখো যেই তার সাক্ষাৎ লাভ করবে সে যেন অবশ্যই আমার সালাম তাকে বলে" (তিরবানী; আল্ আওসাত ওয়াস্ সাগীর)।

উপরোক্ত হাদীসকে বুঝতে চেষ্টা না করে এবং যারা বুঝেছে তাদের কথা না শুনে, আজকালকের অনেক আলেম এর বাহ্যিক শাব্দিক অর্থের পেছনে লেগেছে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে এবং এতবেশি অভদ্রতার বন্যা বইয়ে দিয়েছে যে, বলার মত নয়, আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় চাই। আমরা তো অবশ্যই সবসময় আল্লাহ্র আশ্রয় খুঁজি এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ঠিকই শায়েস্তা করছেন এবং ভবিষ্যতেও তিনি তাদেরকে শায়েস্তা করবেন, ইনশাআল্লাহ্।

আলোচ্য হাদীস থেকে একথাও স্পষ্ট জানা যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ন্যায় বিচার করবেন। কোন কথাই তিনি ন্যায় বিচারের বিপরীত করবেন না। তিনি এমন ইমাম হবেন যিনি পৃথিবীতে ন্যায় বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সুতরাং সবাই যেন তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে চলে, তাঁর শিক্ষামত জীবনযাপন করে। কারণ তিনি তো ন্যায়বিচার ও সত্যের শিক্ষা দিবেন এবং সে শিক্ষা কুরআনী শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা হবে না।

আজকাল তো তারা বলছে মসীহ্ হাতুড়ি নিয়ে আসবেন এবং ক্রশ ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে মানুষের পিছে পিছে চলতে থাকবেন এবং এভাবে ক্রুশ ভেঙ্গে বেড়াবেন। এসব অর্থহীন কথাবার্তা। আসল কথা স্পষ্ট কথা এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আসবেন এবং নিজ ইমাম আঁ-হযরত (সঃ)-এর অনুসরণে যুক্তি-প্রমাণ-দলিল দিয়ে ক্রুশীয় মতবাদকে ভেঙ্গে দিবেন। দজ্জাল ধ্বংসের অর্থও এই যে, দজ্জালী ফেৎনা থেকে উম্মতকে উদ্ধার করবেন। যেহেতু অস্ত্রের যুদ্ধ থাকবেনা তাই জিযিয়ার প্রচলন থাকবে না। তারপর হাদীসে হযরত মাহ্দী (আঃ)-কে সালাম বলারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ মুসলমান তাঁকে সালাম না বলে তাঁর বিরোধিতা করে চলেছে। আল্লাহ্ তাদের বিবেক বুদ্ধি দিন।

তারপর আরো হাদীস আছে যা থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রূহানী মর্যাদা জানা যায় যে, কেন আমরা তাঁর আনুগত্য করব? হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যতদিন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম ন্যায়বিচারক হয়ে আসবেননা ততদিন কিয়ামত আসবে না। যখন তিনি আসবেন তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর মারবেন, জিযিয়ার প্রচলন শেষ করবেন; এত বিপুল পরিমাণ মাল বিতরণ করবেন যে, মানুষ গ্রহণ করতে চাইবে না।" (সুনান ইবনে মাজাহ্ কিতাবুল ফিতান)

এ সমস্ত হাদীস বুঝতে হবে, যাদের মোটা বুদ্ধি তারা বাহ্যিক শাব্দিক অর্থ চিন্তা করে বসে থাকে। অথচ [কত অদ্ভুত চিন্তা যে, পৃথিবীর শূকর জাতীয় ইতর প্রাণীগুলোকে মারতে আসবেন ঈসা (আঃ)] খুব সহজে বুঝা যায় যে, এর অর্থ হবে এ জাতীয় স্বভাবের মানুষগুলোকে শেষ করবেন তিনি। শূকরের যে জঘন্য স্বভাব, অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বেশি জঘন্য তা সবাই জানে। যখন মানুষের মধ্যে এ স্বভাব দেখা দেয় তখন তা শেষ করে মানব সমাজকে পরিষ্কার করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।"

এরপর ধন-সম্পদ বিতরণের বিষয়টি চিন্তা করা উচিত। এ সময় মনে পড়ছে কিছু দিন পূর্বেই তো পাকিস্তানে আলেমদের একদল জনসভা করে বক্তৃতায় আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে অকথ্য গালিগালাজ করেছে। সেখানে এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে যে, হযরত মসীহ্ এসে তো সম্পদ বিতরণ করার ছিল- মানুষের কাছ থেকে মাল চাওয়ার কথা তো ছিল না। দেখ, আহমদীরা (তারা বলে কাদিয়ানী) চাঁদা তুলে। সুতরাং একটা মিথ্যা তারা এভাবে বিচার করছে।

এখন যাদের বিচারবুদ্ধি এমন অন্ধ তাদেরকে কে বুঝাবে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তো আধ্যাত্মিক সম্পদ বিতরণ করছেন যা তোমরা নিতে অস্বীকার করে বসে আছ? আসল কথা এই যে, এসব পার্থিব জগতে বিচরণকারীদের তো চোখ একটাই। এরা তো এর উর্ধ্বে উঠতেও পারবেনা। সুতরাং এটাই তাদের কাজ যা তারা করছে। তাদের কাজ তাদের করতে দেন। আমাদের পাকিস্তানী ভাইদের বিচলিত হবার কিছু নেই। তাদের এসব খারাপ ও বেহুদা কথাবার্তা শুনে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সাহসিকতার সাথে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে পথ চলতে হবে। তাদের এমন মন্দ আচরণের সামনে আমরা সত্যিই পরাজিত। আমরা এ রকম মন্দের মোকাবেলায় তাদের সাথে বিজয়ী হতে পারি না। কিন্তু একটি কথা আমি বলে দিচ্ছি, স্পষ্ট করে দিচ্ছি, **'যখন বান্দারা মুখ বন্ধ রাখবে তখন তাদের খোদা বলবেন।' আর যখন খোদা বলেন, তখন বিরোধীদেরকে টুকরা টুকরা হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে আমরা দেখেছি এবং ভবিষ্যতেও দেখব ইনশাআল্লাহ্। অতএব আহমদীরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে নিজ সম্পর্ক সুদৃঢ় করুন এবং দোয়ায় মনোনিবেশ করুন। সারাক্ষণ দোয়ারত থাকুন।**

আলোচিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) মুসলমানদের ইমাম হবেন। সুতরাং আমাদের জন্য তাঁর আনুগত্য আবশ্যক। অতএব, তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তোমাদের তরবিয়তের জন্য যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন তদানুসারে আমল কর যেন এ ভাবে আঁ-হযরত (সঃ)-এর প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত হও। এবং আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হও।

এবার ইমামের প্রতি অনুগত হওয়ার নির্দেশ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস পেশ করছি ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ

"স্বচ্ছলতা হোক বা অস্বচ্ছল অবস্থা হোক, আনন্দমুখর পরিস্থিতি হোক বা নিরানন্দ হোক, ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক বা স্বজনপ্রীতি হতে দেখ, যেকোন অবস্থা হোক, সকল অবস্থায় তোমাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকদের আদেশ মেনে চলা এবং তাদের আনুগত্য করা তোমাদের জন্য ফরয।" [মুসলিম, কিতাবুল এমারত] ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার নেতা বা আমীরের মধ্যে কোন বিষয় লক্ষ্য করে যা তার দৃষ্টিতে অপ্রিয় তখন সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যে ব্যক্তি জামাত হতে এক বিঘতও দূরে সরে যায় সে জাহেলীয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।"

হযরত আরফজাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা যখন এক হাতের উপর একত্রিত হও এবং তোমাদের মধ্যে

একজন আমীর নিযুক্ত হয়ে থাকেন। তারপর কেউ এসে যদি তোমাদের এই একতার (ঐক্যবদ্ধ অবস্থাকে] লাঠিকে ভাঙ্গতে চেষ্টা করে. তোমাদের জামাতের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, তোমরা তাকে হত্যা কর।" (অর্থাৎ তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর এবং তার কথা শুনবে না।) [সহী মুসলিম]

হযরত ওবাদা বিন ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত "আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর হাতে এ কথার উপর বয়াত করেছি যে, আমরা তাঁর (সঃ) কথা শুনব এবং মান্য করব। সে কথা আমাদের ভাল লাগুক বা না-লাগুক। আমরা যেখানেই থাকিনা কেন, কোন কিছুর প্রাপকের সাথে ঝগড়া করব না। সত্যের উপর দৃঢ় অবস্থান নেব এবং সত্য কথাই বলব এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন দোষারোপকারীর দোষারোপের ভয়ে ভীত হব না।" [মুসলিম, কিতাবুল এমারাত]

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার আনুগত্য করা থেকে নিজেকে পৃথক করে সরে পড়েছে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যে, তার হাতে কোন দলিল বা অজুহাত থাকবেনা। এরপর সে যদি সেই অবস্থায় মারা যায় যে, সে ইমামের হাতে বয়াত করেনি তাহলে সে জাহেলীয়তের মৃত্যু মরবে।"

সুতরাং আপনারা সেই ভাগ্যবান যে, আপনারা যুগ ইমামের হাতে বয়াত করেছেন, তাঁকে মেনেছেন। এখন খাঁটি অন্তরে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে তাঁর আনুগত্য করবেন। তাঁর সমস্ত আদেশ-নির্দেশসমূহকে কার্যে পরিণত করবেন। নতুবা আবার আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বাইরে বেরিয়ে গেছেন বলে গণ্য হবেন। আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে আনুগত্যের উত্তম নমুনা হবার শক্তি দান করুন। আপনারা সবাই উত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করুন এবং এটা কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার উপর আমল করেই সম্ভব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমাদের জামাতে কেবল সে-ই প্রবেশ করে যে আমাদের শিক্ষার উপর আমল করাকে জরুরী মনে করে এবং এর উপর আমল করতে সর্ব রকমে চেষ্টা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল নাম লিখিয়ে শামিল হয় এবং আমল করে না সে যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ্‌তাআলা এ জামাতকে একটি বিশেষ জামাত বানাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে জামাতে শামিল হয়নি, কেবল নাম লিখিয়েছে, সে জামাতে থাকতে পারবেনা। তার জন্য কোন না কোন দিন এমন সময় এসে যাবে যে, সে পৃথক হয়ে যাবে। এ জন্য যতদূর সম্ভব, নিজের কার্যক্রম, নিজেদের আমলকে জামাতের শিক্ষার অধীনে নিয়ে আস - যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।"

এরপর এখানে শিক্ষার কথা বলেছেন ঃ

"ফেৎনা (বিশৃঙ্খলা) করো না, মন্দ কাজ করো না, গালি খেয়ে ধৈর্য ধারণ কর, কারো সাথে মুকাবেলা (প্রতিযোগিতা) করো না। যে তোমার সাথে মোকাবেলা করতে চায় তার সাথে ভাল ব্যবহার এবং নেকীর আচরণ কর। মিষ্টভাষী হও, সুন্দর নমুনা দেখাও। খাঁটি অন্তরে প্রত্যেক আদেশের উপর আমল কর, আনুগত্য কর যেন খোদাতাআলা সন্তুষ্ট হন। শত্রুরাও যেন জেনে যায় যে, এ ব্যক্তি বয়াতের পরে ওরকম নেই যেরকম ছিল, মামলা-মুকদ্দমায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর। এতে যারা দাখিল হয়েছে তাদের উচিত তারা যেন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে, পুরো শক্তি ব্যয় করে, জান প্রাণ দিয়ে সৎপথের পথিক হয়ে যায়- এ পৃথিবী শেষ প্রান্তে এসে গেছে।"

এখানে বলেছেন, ফেৎনা হতে পারে এমন কথাই বলোনা। অনেকের এমন অভ্যাস থাকে, কেবল হাসাহাসি করতে গিয়ে এক স্থানের কথা অন্য স্থানে গিয়ে বলে দেয়, যা থেকে ফেৎনা সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ হয়, যার সামনে কথা বলা হয় এবং তারই সম্পর্কে যদি বলা হয় তাহলে অবশ্যই তার মনে কষ্ট হবে এবং অপরজন সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে, যদিও এমন কথা শুনে মন খারাপ করা আমার মতে উচিত নয়। এমন ফেৎনাকে রোধ করতে হলে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে এমন বলেছে তার কাছে গিয়ে স্পষ্ট কথায় বলে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, 'তুমি কি এমন কথা বলেছ যা আমাকে বলা হয়েছে? এভাবে সময়মত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং যার দ্বারা ফেৎনা হতে যাচ্ছিল এরও সংশোধন হয়ে যাবে। নতুবা এভাবে তো অনেক সময় ফেৎনা সৃষ্টিকারীর চেষ্টায় এক পরিবার ও অন্য পরিবারের মধ্যে বড় লড়াই-ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। অতএব, ফেৎনার কথা থেকে নিজেও বিরত থাক, ফেৎনা সৃষ্টিকারীদের থেকেও নিজেকে রক্ষা কর। সম্ভব হলে তাদের সংশোধনের চেষ্টা কর।

এরপর মন্দ বা অমঙ্গল সরাসরি ঝগড়াঝাটি বা গালাগালি থেকে আরম্ভ হয়ে যায়। এর থেকেও ফেৎনা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে হযরত (আঃ) বললেন, 'তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ; আমার আনুগত্য করবে বলে কথা দিয়েছ, তোমাদের জন্য আমার শিক্ষা এই যে, সকল প্রকার অশুভ, বা মন্দ কথা এবং ফেৎনার কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখ। তোমার ধৈর্য এবং অন্তরের বিশালতা এতটা প্রশস্ত হওয়া উচিত যে তোমাকে যদি কেউ গালিও দেয় তবু তুমি ধৈর্য ধর। এ শিক্ষাকে যদি তোমরা কার্যে পরিণত কর তাহলে মুক্তির পথ তোমার জন্য উন্মুক্ত হবে। তোমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কোন বিষয়েই প্রতিযোগিতার মনোভাব ঠিক হবে না। সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীদের মত নিজেকে ছোট করে মাথা নত করে রাখ। যে যা খুশী বলুক, কিন্তু তুমি তার সাথে স্নেহ, ভালবাসা ও আন্তরিকতার পরিচয় দাও। তোমরা এমন মিষ্টভাষী হও-এমন পবিত্র কথা বল যে, তোমাদের থেকে কেবল উত্তম চরিত্রই প্রকাশ পায়। মানুষ তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তোমরা যে পরিবেশে থাক, সবাই যেন বুঝতে পারে যে, এরা আহমদী। এর দ্বারা উত্তম চরিত্র ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। তোমাদের উত্তম চরিত্রই মানুষকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

অনেক সময় মানুষ নিজের কোন স্বার্থের জন্য মিথ্যা সাক্ষী দেয়। অনেক সময় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এ সম্পর্কে হযরত (আঃ) বলেছেন, 'তোমাদের নিজেদের স্বার্থও যেন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষী দিতে বাধা সৃষ্টি না করে।

অনেকে এখানে দেশের বাইরে এসেও কোন দেশে থেকে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলে। এমন করা উচিত নয়। যা সত্য তা দিয়েই নিজের কেস (Case) তৈরী কর- এতে যদি তোমার আপীল গৃহীত হয় হোক, নতুবা নিজের দেশে ফেরত চলে যাও। কারণ, অসত্য কথা বলার পরও তো অনেকের কেস (Case) প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। অতএব, সত্যের উপর দাঁড়িয়ে পরীক্ষা কর, লাভ হবে ইনশাআল্লাহ্। যদি কেস (Case) প্রত্যাখ্যান হয়ে যায় তবুও আল্লাহ্ তো খুশী হবেন!

তারপর পরস্পর ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ.

"পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি কর এবং পশুত্ব পরিত্যাগ কর, পরস্পর ভেদাভেদ পরিত্যাগ কর। সকল প্রকার হাসি-ঠাট্টা পরিহার কর। কারণ হাসি-ঠাট্টা মানুষকে আস্তে আস্তে সত্য হতে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরস্পর একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন কর। প্রত্যেকে নিজের আরামের উপর অন্য ভাইয়ের আরামকে অগ্রাধিকার দাও। আল্লাহ্‌তাআলার সাথে সত্যি সত্যিই আপোস কর এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্যে ফেরত আস। পরস্পরের মধ্যকার সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, উত্তেজনা ও শত্রুতাকে মধ্যখান থেকে সরিয়ে দাও (কারণ আজ এমন সময় যখন ছোট ছোট কথাকে ভুলে

গিয়ে বড় বড় কাজে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

আল্লাহ্তাআলার সাথে আমাদের জামাতের সম্পর্ক খুবই সত্য ও খাঁটি হওয়া উচিত। আমাদের লোকদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেননি। বরং তাদের ঈমানী শক্তিগুলোকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করার জন্য নিজ শক্তির শত শত নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন।"

হযরত (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে বলতে পারবে আমি কোন নিদর্শন দেখিনি? আমি দাবী করে বলতে পারি, এমন একজনও নেই, আমাদের সাথে কিছুদিন অবস্থান করেছে কিন্তু সে কোন তাজা নিদর্শন দেখেনি।

আমাদের জামাতের লোকদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকা খুবই জরুরী, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে থাকা, ঐশী জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকা পুণ্য কর্মে শিথিলতা ও অলসতা দূর হওয়া আবশ্যক। কারণ অলসতা যদি থাকে তাহলে তো ওযু করাও বড় কষ্টকর মনে হয়, তাহজ্জুদ পড়া তো দূরের কথা। পুণ্যকর্ম সম্পাদনের শক্তি যদি না থাকে, পুণ্যকর্মে অন্যের তুলনায় এগিয়ে যাওয়ার উদ্যম যদি না থাকে তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখার কোন উপকার সে পাবে না"।

আমরা বয়াতের ১০ম শর্ত নিয়ে আলোচনা করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর সাথে এমন শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপনের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যার কোন তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সম্পর্কের সাথে হয়না। এর কারণ কেবল আমাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। আমাদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে (এই শর্ত) কারণ একমাত্র হযরত (সাঃ)-কে মান্য করার মাধ্যমেই ইসলামকে পাওয়া সম্ভব এবং নিজেকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নৌকাতে উঠে বসা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমার পাণে দৌড়াও, এটাই সময়' যে ব্যক্তি এ সময় আমার পাণে দৌড়ায় তাকে আমি এমন ব্যক্তির সাথে তুলনা করব যে প্রবল বন্যার সময় জাহাজে উঠে বসে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মানে না, তো আমি তাকে দেখছি, সে নিজেকে বন্যার কবলে ফেলে দিচ্ছে অথচ তার হাতে নিজেকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থা নেই। সত্যিকারের শাফায়াতকারী আমি, যে আসলে মহান ও বুযূর্গ শাফায়াতকারীর ছায়া ও প্রতিবিম্ব-তাকে এ যুগের অন্ধরা গ্রহণ করল না। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) (এর ছায়া আমি)" [দাফেউল বালা রূহানী খাযায়েন; ১৮ খন্ড; ২৩৩ পৃষ্ঠা]

আঁ হযরত (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবী রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমার হাতে যে বয়াত করা হয় এতে দুটো উপকার আছে। এক এই যে, পাপ মোচন হয় এবং আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে মানুষ আল্লাহ্র ক্ষমার অধিকারী হয়। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্র প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট মামুরের হাতে তাওবা করলে শক্তি লাভ হয়। মানুষ শয়তানের আক্রমণ হতে রক্ষা পায়। স্মরণ রাখ, এ জামাতে প্রবেশের উদ্দেশ্য যেন পার্থিব জীবন না হয়। বরং আল্লাহ্র সুন্তুষ্টি লাভ যেন উদ্দেশ্য হয়। কারণ এ পৃথিবী অতিক্রম করে চলে যাবার স্থান যা-- কোন না কোনভাবে অতিক্রম হয়েই যাবে। ... ইহ জীবনের উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি পৃথক রাখ। সেগুলোকে ধর্মের সাথে মিশাবে না। কারণ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ধর্ম ও এর ফলাফল অবশিষ্ট থাকবে।" (মলফূযাত; ৬ খন্ড; ১৪৫ পৃঃ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"এবং হে আমার আপনজনেরা, প্রিয়জনেরা, আমার অস্তিত্ব-বৃক্ষের তরতাজা সবুজ শাখা - প্রশাখারা! যারা আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে যা তোমাদের উপর হয়েছে, আমার বয়াতের ধারাবাহিকতায় প্রবেশ করেছ, তোমরা তোমাদের জীবন, তোমাদের আরাম, তোমাদের ধন-সম্পদ, তাঁর (আল্লাহ্র) পথে উৎসর্গ করতে থাক। আমি যদিও জানি যে, আমি তোমাদের যা বলব, তোমরা তা গ্রহণ করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করবে এবং যতদূর তোমাদের শক্তি সামর্থ হবে তোমরা কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করবেনা। কিন্তু তবুও আমি এ খেদমতের জন্য নিজের মুখে তোমাদের উপর কোন কিছু সুনির্দিষ্ট করে নির্ধারিত করতে পারিনা যেন তোমাদের খেদমত (সেবা) আমার নির্দেশের কারণে বাধ্যতামূলক হয়ে যায় বরং তা যেন তোমাদের খুশী ও আনন্দের মধ্যে হয়। কে আমার বন্ধু? কে আমার আপন? সে-ই যে আমাকে চিনে, কে আমাকে চিনে? কেবল সে-ই যে আমার উপর ঈমান রাখে যে, আমি প্রেরিত হয়েছি। এবং আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করে যেমন-তাঁরা গৃহীত হয়েছেন যারা প্রেরিত হয়েছেন। পৃথিবীর (সাথে জড়িত) মানুষ আমাকে গ্রহণ করতে পারেনা। কারণ, আমি পৃথিবী থেকে নই। তবে যার প্রকৃতিতে সেই জগতের (আধ্যাত্মিক জগতের) কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে সে আমাকে গ্রহণ করে এবং করবে। যে আমাকে পরিত্যাগ করে, তিনি (আল্লাহ্) তাকে পরিত্যাগ করেন- যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। যে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনিও তার সাথে তা করেন- যার পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে একটি প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসে অবশ্যই সে আলোর অংশ লাভ করবে। কিন্তু যে সন্দেহ করে এবং কু-ধারণা পোষণ করে এবং আমার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায় সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। এ যুগের নিরাপদ দূর্গ আমিই। যে আমাতে প্রবেশ করে সে চোর-ডাকাত এবং হিংস্র পশু-জানোয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কিন্তু যে আমার প্রাচীরের অর্থাৎ দেয়ালের বাইরে দূরে থাকতে চায়- চতুর্দিক থেকে সে মৃত্যুর মুখোমুখি হবে এবং তার মৃতদেহও নিরাপদ হবেনা। আমার মাঝে কে প্রবেশ করে? সে-ই যে পাপকে পরিত্যাগ করে এবং পুণ্যকে অবলম্বন করে, বক্রতাকে পরিত্যাগ করে সততার সাথে পদক্ষেপ নিতে থাকে। শয়তানের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহ্তাআলার অনুগত বান্দা হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে এমন করে সে আমার মাঝে আছে। এবং আমি তার মাঝে। কিন্তু কেবল সে-ই এমন, করতে পারে যাকে আল্লাহ্তাআলা পবিত্রকৃত আত্মার ছায়ায় রাখেন। তখন সে তার নফ্সের দোযখে পা রাখে এবং সেই দোযখ তখন ঠান্ডা হয়ে যায় এমন, যেমন কখনও সেখানে আগুন ছিলই না। তারপর সে উন্নতির পর উন্নতি লাভ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র রূহ তার মাঝে অবস্থান গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল - আলামীনের একটি বিশেষ তাজাল্লী (জ্যোতির বিকাশ) তার হৃদয়ের উপর পতিত হয়" [অর্থাৎ তার হৃদয়ের উপর আল্লাহ্র ছায়া পড়ে] "তখন তার মধ্যকার পুরাতন মনুষ্য জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় এবং একটি নতুন মনুষত্ব তাকে প্রদান করা হয়। খোদাও তখন নতুন খোদা হয়ে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এবং বেহেশ্তি জীবনের সমস্ত উপকরণ সে ইহজীবনেই পেয়ে যায়।" [ফাতাহ্ ইসলাম; রূহানী খাযায়েন; ৩খন্ড; পৃঃ ৩৪]

আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সাথে কৃত সকল অঙ্গীকার পালনের শক্তি দান করুন। হযরত (আঃ) এর বয়াতের সকল শর্তের উপর আমরা যেন কায়েম থাকি। হযরত আকদস (আঃ) এর দেয়া শিক্ষানুসারে জীবন যাপন করে আমরা যেন এখানে বেহেশ্তি জীবন লাভ করতে পারি এবং পরবর্তী জীবনেও যেন বেহেশ্ত লাভ করি। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সাহায্য করুন।

[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ১৪ নভেম্বর, ২০০৩ইং]

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ্‌তাআলার 'খবীর' সিফতের ব্যাখ্যা

আল্লাহ্‌তাআলার সিফত খবীর সম্পর্কে আলোচনা, কুরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী ও সেগুলোর পূর্ণতার বিবরণ]

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ১৮ এপ্রিল, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র রাবে' (রাহেঃ)-এর জীবনের এটাই শেষ খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর বলেন, কুরআন করীমের আরো কয়েকটি আয়াত যাতে আল্লাহ্‌তাআলার সিফত 'আল-খবীর'-এর উল্লেখ আছে প্রথমে পড়ে শোনাচ্ছি।

সূরা নিসা আয়াত ঃ ৯৫

"হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন তোমরা ভালভাবে তদন্ত করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম বলে তাকে বল না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে প্রচুর সম্পদ আছে। তোমরাও ইতঃপূর্বে এরূপ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা ভাল করে তদন্ত করে নিবে। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন।"

পরবর্তী আয়াত ঃ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে (শান্তিতে) এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হতে যারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জেহাদ করেছে তাদেরকে স্বতন্ত্র করে দেননি এবং আল্লাহ্ এবং রসূল এবং মু'মিনগণকে ছাড়া (অন্য কাউকে) অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নিই।' এবং তোমরা যা কিছু কর তা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত" (সূরা তৌওবা ঃ ১৬)।

এরপর সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং-৯৭ ঃ

"তুমি বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদেরকে উত্তমরূপে জানেন ও দেখেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "সকল বান্দার উপর তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব; তিনিই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ও প্রত্যেক বস্তুর সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। সকল প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত।"

এবার আমি ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে সে সম্পর্কে কুরআন শরীফে যা বলা হয়েছে তার কিছু কিছু কথা এখানে উল্লেখ করছি।

সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৭

"পবিত্র তিনি যিনি সকল বস্তুকে যা পৃথিবী উৎপাদন করে এবং স্বয়ং তাদেরকে এবং ওদেরকে যাদেরকে তারা জানে না; জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।"

আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে আরবরা খেজুরের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের জ্ঞান রাখত। তারা কল্পনাও করেনি যে, অন্যান্য ফল ইত্যাদির সব কিছুরই জোড়া আছে। এ আয়াত বলছে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু জোড়া জোড়া। আজকের বিজ্ঞানীরা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, তাদের আবিষ্কার অনুসারে কেবল প্রতিদিন উদ্ভিদেই নয় বরং মলিকিউলস্ ও এটমস্ ও (অণু-পরমাণু) ও জোড়া জোড়া আছে। প্রত্যেক অণু পরমাণুও জোড়া জোড়া। বস্তু এবং যা বস্তু নয় তাও জোড়া জোড়া। অর্থাৎ যদি সমগ্র সৃষ্টিকে একত্রিত করে দেয়া হয় তাহলে, প্রত্যেক বস্তু তার বিপরীতের সাথে মিলিত হয়ে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিষয়টি বড় গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয় কিন্তু সৃষ্টির রহস্য বুঝতে হলে এটা বুঝা অত্যন্ত জরুরী।

পৃথিবীর পরিধির বিস্তার ও ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে তথ্য ও খবর দেয়া হয়েছে ঃ

সূরা ইনশিকাক ঃ ৮৪ঃ৪, ৫

"এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে ইহা তা বাহির করে দিবে এবং এটি শুন্য হয়ে যাবে।"

এতে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠেকে বিস্তৃত করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এমনিতে এটা বুঝা যায় না যে, যমীন বা ভূপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুরআনের বর্ণনাতে দেখা যাচ্ছে যে, ভূ-ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটি অর্থ এই যে, আমেরিকা আবিষ্কার হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যুগে ভূগর্ভের সবচেয়ে বেশি সম্পদ উদ্ঘাটিত ও উত্তোলিত হয়েছে এবং হচ্ছে এমন যেমন ভূগর্ভ শূন্য হয়ে যাবে। বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। ১৪৯২ইং সনে ক্রিসটোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার হয়েছে অন্য সময়।

Divide and Rule 'বিভক্তি কর এবং শাসন কর'-নীতির ভিত্তিতে শাসন ক্ষমতার সরকার সম্পর্কে কুরআনে খবর দেয়া হয়েছিল।

সূরা ঃ ফালাক

"এবং সম্পর্ক বন্ধনে [বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য] ফুৎকার কারিনীদের অনিষ্ট থেকে, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।'

এটি একটি অনেক বড় ভবিষ্যদ্বাণী, এমন জাতিসমূহের সম্পর্কে যাদের শাসন ক্ষমতার রহস্য Divide and Rule নীতির মধ্যে করতে চায় তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয় যেন তারা নিজেরা অন্তর্দ্বন্দ্বে লড়াই করে করে শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং তখন এরা গিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসে। পশ্চিম জগত বিশেষ করে ইংল্যান্ড এই নীতির উপর ভিত্তি করে সারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করেছে। সকল সম্রাজ্যবাদের সারাংশ এটাই যদ্বারা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। এরপরও এটাই চূড়ান্ত সত্য যে ইসলাম অগ্রগতি ও

উন্নতি লাভ করবে এমন অবস্থায় যে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি পৌছে যাবে। অতএব, হিংসা সৃষ্টি হতে পারে না। হিংসার বিষয়টি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম অবশ্যই অগ্রগতি লাভ করবে। যখনই ইসলাম উন্নতি করবে শত্রু হিংসা করবে।

শান্তির নামে যুদ্ধের খবর।

সূরা কাহাফ ঃ ২৬

"এবং তারা তাদের প্রশস্ত গুহায় তিনশ' বছরের যুগে গণনাকৃত কয়েক বছর অবস্থান করেছিল এবং তারা (আরও) নয় বছর বাড়িয়েছিল।"

এ সমস্ত গুহায় যারা অবস্থান করেছিলেন- আমি নিজেই সেই গুহায় প্রবেশ করে দেখেছি। কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! চিন্তা করা যায় না, ভয় হয় যে, তারা কিভাবে ওসব গুহায় অবস্থান করেছিল। যারা তৌহীদের অনুসারী ছিল তারা মুশরিকদের অত্যাচারের ভয়ে গুহায় অবস্থান করত। তারা ভূগৃষ্ঠের থাকার তুলনায় গুহার মধ্যে থাকা শ্রেয় মনে করেছিল। ভেতরের অবস্থা দেখলে ভয় হয় যে, তারা কিভাবে ওর মধ্যে অবস্থান করেছে। তাদের সম্পর্কে এ কথার উল্লেখ আছে যে, যখন তারা বিজয় লাভ করেছিল, তারা ভেবেছিল যে সেখানে কি করা যায়? তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা মসজিদ বানাবে। কারণ তৌহীদে বিশ্বাসী ছিল তারা।

পাহাড় সমতুল্য সুউচ্চ সামুদ্রিক জাহাজ নির্মিত হওয়ার খবর।

সূরা রহমান ঃ ২৫

"এবং সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগুলি তাঁরই সৃষ্টি। এ আয়াতে বর্ণিত ঐশী খবর (এ যুগে) বিরাট বিরাট সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। ১৮৬০ইং এ প্যারামাউন্ট-এর সকল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমেরিকা থেকে সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এরপর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ সফর করতে পারে এমন সামুদ্রিক জাহাজ তৈরী হয়েছে। ১৪ইং এপ্রিল, ১৯১২ইং তারিখে পৃথিবীর একটি অতি বৃহৎ সামুদ্রিক জাহাজ টাইটানিক ইংল্যান্ড থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। এতে ২২০৬ জন মানুষ ভোগবিলাসের সামগ্রী নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিল। তাদের বড় দাবী ছিল যে, বড় সুনির্দিষ্ট জাহাজ তাদের বিরাট সাফল্য। তারা জানত না যে, সেই জাহাজ প্রথম যাত্রাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার কোন চিহ্নও থাকবে না। আজকাল আমেরিকা ইরাকের উপর আক্রমণের জন্য যেসব বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজ সমুদ্র পথে এনেছে, এ সব এত বড় বড় জাহাজ যে, একটি জাহাজের উপর থেকে একই সময়ে কয়েকটি উড়োজাহাজ উড়তে পারে।

ভূগর্ভে সমাহিত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বা প্রত্নতত্ত্বের জ্ঞান সম্পর্কে কুরআনের পয়গাম। (আছারে কাদীমা)

সূরা আদিয়াত ১০০ ঃ ১০-১২

"তবে কি সে জানেনা যে, কবরে যা আছে তা যখন উৎপাটিত ও উত্তোলন করা হবে; এবং বক্ষঃদেশে যা কিছু (লুক্কায়িত আছে) তা বের করে আনা হবে, নিশ্চয় সেদিন তাদের প্রতিপপালক তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হবেন।"

আছারে কাদিমা - প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে মাটির ভিতর থেকে যেসব অতীতের বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে- এটিও একটি অতি আশ্চর্যজনক অধ্যায়। আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে কেউ কল্পনাও করেনি পরবর্তীকালে মাটির ভিতর থেকে কবর ভেদ করে অতীতের বহু কিছু আবিষ্কার হবে। আজ সারা পৃথিবীর সবাই জানে যে, একাজ চলছে।

এরপর বলা হয়েছে,

"এবং যখন কবরসমূহকে উৎপাটিত করা হবে, তখন প্রত্যেক আত্মা (প্রত্যেক নাফস্) জানতে পারবে যে, সে অগ্রে কি পাঠিয়েছে এবং পশ্চাতে কি ছেড়ে এসেছে" (সূরা ইন ফিতাব ঃ ৫, ৬)।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্তমান যুগের উন্নতির কথা বলা হয়েছে। 'কবর থেকে বের করা হবে'- এর অর্থ এই যে, ভূগর্ভের প্রত্নতত্ত্বের (Archaeology) বিরাট উন্নতির কথা বলা হয়েছে। আজ আমাদের চোখের সামনে যা পূর্ণতা লাভ করেছে। এ বিষয়ে যারা বিজ্ঞানী তারা ভূগর্ভে লুক্কায়িত হাজার হাজার পুরানো তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

এবার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র হাদীসের বর্ণনা থেকে কিছু অংশ আপনাদের সামনে পেশ করছি। আঁ-হযরত (সঃ)-এর এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণ হবে যে, আঁ-হযরত (সঃ)-কে এসব খবর যিনি দিয়েছিলেন তিনি আলীম ও খবীর মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ ছিলেন।

আঁ-হযরত (সঃ) সূরাকা বিন মালেক সম্পর্কে খবর দিয়েছিলেন। আঁ-হযরত (সঃ) যখন মক্কা ছেড়ে হিজরত করে রওয়ানা হয়ে গেলেন, মক্কাবাসীরা হুযূর (সঃ)-কে ধরে আনবার জন্য একশ' উটের পুরস্কার ঘোষণা করল। এই পুরস্কারের লোভে সুরাকা বিন মালেকও আঁ হযরত (সঃ)-কে ধরে আনবার জন্য রওয়ানা হয়ে গেল। আঁ-হযরত (সঃ)-এর সওর গুহায় ৩ দিন অবস্থান করার পর একটি অপরিচিত পথ ধরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে মদিনাভিমুখে যাচ্ছিলেন। সুরাকা বিন মালেক আঁ-হযরত (সঃ)-এর পেছনে পৌছে গেল। আরো কাছে গেলে সুরাকার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে যেতে লাগল। এতে সে ঘাবড়ে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখল যে, ফল তার পক্ষে না। তখন সুরাকা আঁ-হযরত (সঃ)-এর কাছে শান্তির বার্তা-সনদ চাইল। আঁ-হযরত (সঃ) তাকে তেমন একটি সনদ চামড়ার উপর লিখে দিলেন। পরে আঁ হযরত (সঃ) সুরাকাকে বললেন, "সুরাকা তোমার অবস্থা কি হবে যখন তোমার হাতে ইরান সম্রাটের হাতের বালা পরানো হবে?"

এখানে একটি কথা বিতর্কযোগ্য যে, হুযূর (সঃ) চামড়ার উপর সনদ লিখে দিলেন। আঁ-হযরত (সঃ) তো লিখতে জানতেন না। সম্ভবত এর অর্থ হবে, আবূ বকর (রাঃ)-কে দিয়ে লিখিয়েছিলেন।

একথা শুনে সুরাকা হতভম্ব হয়ে গেল যে, এ কি করে সম্ভব? আরবের এক বেদুইন আর ইরান সম্রাটের হাতের সোনার বালা?

এরপর হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে ইরান সম্রাটের পতন হলো। মালে গনিমত হযরত উমর (রাঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হলো। এর মাঝে সম্রাটের হাতের বালাও ছিল। হযরত উমর (রাঃ) সুরাকাকে ডেকে এনে নিজের সামনে ইরান সম্রাটের হাতের বালা পরিয়েছিলেন, যা বহু মূল্য রত্ন জড়ানো ছিল। (সূরাকা মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছিলেন) এভাবে আঁ হযরত (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছিল।

আল্লামা ইবনে সাদ লিখেছেন, হযরত উমর (রাঃ) সুরাকাকে যখন ইরান সম্রাটের রাজকীয় পোষাক ও বালা পরালেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

অপর রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)'র কাছে ছিলাম। আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর পোষাক ছিল দামী কাতান কাপড়ের। আবার কাতানের রুমালে তাদের নাক পরিষ্কার করতেও দেখলাম। আবূ হুরায়রাহ্ বলছিলেন, বাহ্! আবূ হুরায়রাহ্! আজ তোর কত ইযযত! তুমি কাতান কাপড়ের রুমালে নাক পরিষ্কার করছ!!"

কাতান কাপড় ইরান বিজয়ের পর হযরত উমর (রাঃ) ইরানী কাপড় আবূ হুরায়রাহ্‌কে পাঠিয়েছিলেন। এ রুমাল তো ইরান সম্রাটের কাপড়ের সাথে গুঁজে রাখা থাকত। এর দ্বারা নাক পরিষ্কারের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) তা দিয়ে নাক পরিষ্কার করছিলেন।

আবূ হুরায়রার অবস্থা এ রকম ছিল যে, দারিদ্রতার কারণে অভুক্তও থেকেছেন। অনেক সময় অচেতন হয়ে পড়তেন। মানুষ মনে করত যে, মৃগীর আক্রমণ হয়েছে। তারা তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করত। আঁ হযরত (সঃ) এসে উদ্ধার করতেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) আরো বলেছেন, অনেক সময় ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে কোন কোন ব্যক্তিকে দেখে প্রশ্ন করতাম যে, বল, "এবং নিজেদের দারিদ্র সত্ত্বেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় ..." (সূরা হাশর, আয়াত ১০) এর অর্থ কী? তারা আমাকে আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে চলে যেতেন। তারা মনে করত যে, 'আমি উক্ত আয়াতের অর্থ বুঝি না। আঁ-হযরত (সঃ) শুনে আবূ হুরায়রাহ্‌র কাছে গেলেন এবং অবস্থা জানলেন। আঁ-হযরত (সঃ)-এর হাতে এক গ্লাস দুধ ছিল। হুযূর (সঃ) আবূ হুরায়রাহ্‌কে বললেন, 'আরো যারা অভুক্ত আছে তাদের ডেকে আন। আবূ হুরায়রাহ্ আশ্চর্য হলেন যে, আমার ক্ষুধা মিটাতেই এ দুধ শেষ হয়ে যাবে, হুযূর আরো লোককে ডাকতে বলছেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর আদেশে আবূ হুরায়রাহ্ সাধারণভাবে সবাইকে আহ্বান জানালেন। সবাই এসে গেলে সবাইকে বসিয়ে দিলেন। পরে দুধের পাত্র ডানের প্রথমজনকে দিলেন যে, পান কর। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-কে শেষপ্রান্তে বসার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন, আমি তো দুধ পাব না, তার আগেই শেষ হয়ে যাবে। আঁ-হযরত (সঃ) সবাইকে এক এক করে বললেন দুধ পান কর সবাই পেট ভরে ভরে পান করতে লাগল। অবশেষে আবূ হুরায়রাহ্‌র হাতে দিয়ে বললেন, পান কর। আবূ হুরায়রাহ্ পান করে গ্লাস আঁ-হযরত (সঃ)-কে দিতে চাইলেন আঁ-হযরত (সঃ) বললেন, আরো পান কর। আবূ হুরায়রাহ্ আরো পান করলেন, হুযূর (সঃ) বললেন, আরো পান কর। এবার আবূ হুরায়রাহ্ বললেন, হুযূর আর তো সম্ভব নয়। তখন বাকী আঁ হযরত (সঃ) পান করলেন।"

বদরের যুদ্ধে মুশরিকীনে মক্কার নেতারা কে কোথায় মরে পড়বে, তা আঁ-হযরত (সঃ) বলে দিয়েছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সঃ) চিহ্নও করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, আঁ হযরত (সঃ)-যার জন্য যে স্থান চিহ্নিত করেছিলেন, সে সেই স্থানেই গিয়ে পড়ে মরেছে।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন কিছু লোক পিছে পড়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম আঁ-হযরত (সঃ)-কে বললেন, অমুক অমুক পেছনে পড়ে গেছে (ধীর গতির কারণে) আঁ-হযরত (সঃ) বললেন, তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ যদি তাদের মঙ্গল দেখেন তাদেরকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর না হয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহম করবেন। এ খবরও আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে বলা হলো যে, আবূ যার ও পেছনে রয়ে গেছে। আঁ-হযরত (সঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও।' হযরত আবূ যার নিজের উটের দুর্বলতার কারণে পিছনে রয়ে গেলেন। পরবর্তীতে উটকে পরিত্যাগ করে নিজের মালপত্র নিজের পিঠে নিয়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। আঁ -হযরত (সঃ) এক স্থানে বিশ্রামের জন্য থেকে ছিলেন। সে সময় আবূ যার সেখানে পৌছে গেলেন। আঁ হযরত (সঃ) তাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, আবূ যারের উপর আল্লাহ্ কৃপা করুন, সে একাই চলে, একাই মৃত্যুবরণ করবে। একাই পুনরুত্থিত হবে।' যুগের পরিবর্তন ঘটল, আবূ যার (রাঃ) রবযা নামক স্থানে গিয়ে থাকতে লাগলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ খবর পেয়ে বললেন, 'আঁ-হযরত (সঃ) ঠিক বলেছিলেন, আবূ যার একা সফর করে একাই মারা যাবে একাই তাকে উঠানো হবে।"

হযরত আলী বিন হাতেম বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি এসে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে দারিদ্রতার ও ক্ষুধার অভিযোগ করল, কিছুক্ষণ পরে আরো একজন এসে অভিযোগ করল যে, রাস্তার দুর্বৃত্তেরা মাল লুটে নিয়েছে। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তুমি কি হিরা নামক শহর দেখেছ? সে বলল, দেখিনি, শুনেছি। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তুমি জীবিত থাকলে দেখবে যে, এমন দিন আসবে যখন হিরা থেকে একজন মহিলা সফর করে মক্কা এসে তওয়াফ করে নিরাপদে ফেরত যাবে, সে আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় পাবে না। আলী বিন হাতেম বললেন, তেইই গোত্রের বদ লোকেরা কোথায় যাবে? যারা চুরি লুটপাট ছাড়া কোন কাজ করে না। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখবে ইরান সম্রাটের ধনভান্ডার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।' আমি আরয করলাম, ইরান সম্রাট হুরমুয? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, হ্যাঁ কিসরা বিন হুরমুয।' এরপর আঁ-হযরত (সঃ) আরো বললেন, "যদি তোমার বয়স

দীর্ঘ হয়, তুমি দেখবে, এক ব্যক্তি এক মুঠি সোনা বা রূপা দান করার জন্য লোক খুঁজবে। কিন্তু সে দান কবুল করার মত লোক খুজেঁ পাবে না।" বারী বলেছেন, পরবর্তীকালে আমি দেখেছি, 'মহিলা একা একা দূর থেকে এসে কা'বা শরীফের তওয়াফ করে চলে যায়। তার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। আমিই সেই ব্যক্তি যে, ইরান সম্রাটের ধন-ভান্ডার খুলেছিলাম।'

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এক সময় এসেছিল যে, সব রকম প্রাচুর্য এসেছিল। কারো কোন দারিদ্রতা ছিল না। ভিক্ষা বা সাহায্য প্রদানের জন্য কোন লোক পাওয়া যেত না যে সেই সাহায্য গ্রহণ করবে। একজন সাহাবী রাতে বেরিয়েছিল যে অন্ধকারে কাউকে সাহায্য দেবেন যেন সে গ্রহণ করে। কিন্তু যাকে তিনি দিলেন সেও ধনবান ছিলেন গ্রহণ করেননি।

আঁ-হযরত (সঃ)-এর সকল ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বড় উজ্জ্বলতার সাথে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। একবার আঁ-হযরত (সঃ) ওহদ পাহাড়ের উপরে আরোহন করেছিলেন। পাহাড়ের উপর যেন কম্পন অনুভব করলেন। আঁ হযরত (সঃ) নিজের পায়ের আঘাত করে পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই! তোর উপরে এখনতো একজন আল্লাহ্‌র নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ ছাড়াতো আর কেউ নেই।"

এখান থেকে বুঝা যায় যে, আঁ হযরত (সঃ) জানতেন যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) শহীদ হবেন না। অন্য দু'জন যাঁরা খলীফা নির্বাচিত হবেন তাঁরা শহীদ হবেন।

একবার হযরত আলী (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই দাড়ীকে রক্তে রাঙ্গানো হবে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এর কয়েকটি নমুনা স্বরূপ এখানে বলছি।

ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম, ইসলাম ও আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য আপত্তিকর কথাবার্তা বলত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার সাথে ইসলাম ও সৃষ্টি ধর্ম নিয়ে পনর দিন বিতর্ক করেছিলেন। (জঙ্গে মুকাদ্দাস) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল 'এ বিতর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা অবলম্বন করছে এবং মানুষকে খোদা বানাচ্ছে তাকে পনর মাসের মধ্যে দোযখে ফেলে দেয়া হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর থেকে আথম এত বেশি ভীত হয়ে পড়ল যে, এক শহর থেকে অন্য শহরে দৌড়ে বেড়াতে থাকল। শান্তি পাচ্ছিল না। সব সময় সে স্বপ্নে ভয়ংকর আক্রমণকারীকে দেখত যে, "বড় ছোরা হাতে তার উপর আক্রমণ করছে।' ভয়ে বার বার তওবা করছিল, কান ধরে বলত, যে, আমি তো আঁ হযরত (সঃ)-কে গালি দেই নি।" এক সময় সে বলল, 'আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। তওবা করিনি এখনও আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে মিথ্যা বলেই মনে করি। (নাউযুবিল্লাহ্)।

তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন এবার অবশ্যই আথমের সময় শেষ, এখন সে তওবা করুক বা না করুক অবশ্যই সে জাহান্নামে প্রেরিত হবে। কোন শক্তি তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

হযরত সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল সেই মতই আথম মারা গিয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ নিয়ে পাদ্রী মার্টিন ক্লার্কের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন ডগলাসের আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এটি কি কোন ছোটখাট মামলা ছিল? কেবল ধর্মীয় কারণে, কোন হত্যা কান্ডের কারণে নয়, ধর্মীয় কারণে আমার বিরুদ্ধে (খুনের) মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর শাসনকর্তা। তিনি আমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এমন বিপদ আপতিত হবে, আবার খবর দিয়েছিলেন যে, তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন। এ খবর শ' শ' মানুষকে সময়ের অনেক পূর্বেই জানানো হয়েছিলো। অবশেষে আমাকে নির্দোষ ও মুক্তি দেয়া হলো। সুতরাং এটি আল্লাহ্‌র রাজত্বের প্রমাণ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করলেন। এমন মামলা ছিল যাতে, মুসলিম হিন্দু ও খৃষ্টান সবার সম্মিলিত চেষ্টা ছিল আমার বিরুদ্ধে।

মামলার শেষে জজ সাহেব বলেছিলেন, হযরত (আঃ) কে যে, আপনি ইচ্ছা করলে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন, 'আমার মামলা আকাশের উপরে দায়ের থাকবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে প্লেগের ভয়াবহ আক্রমণ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। দেখানো হয়েছিল, পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে কাল বীভৎস রং এর ছোট ছোট আকারের চারা রোপন করা হচ্ছে। হযরত সাহেবের জিজ্ঞাসার জবাবে ফিরিশ্‌তারা বলেছিলেন, 'প্লেগের আক্রমণের বীজ রোপন হয়েছে, সমগ্র পাঞ্জাবে প্লেগের আক্রমণ হবে। পরবর্তীতে পাঞ্জাবে এত ভয়াবহ প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল যে, প্রতি সপ্তাহে ত্রিশ হাজার মানুষ এবং বছরে কয়েক লক্ষ মানুষ মরতে থাকল পাঞ্জাব ও আশপাশের অঞ্চলে। বছরের পর বছর এ ধ্বংসলীলা চলেছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে এ খবরও দেয়া হয়েছিল, "ইন্নি উহাফেযু কুল্লা মান ফিদ্‌দার।" আমি তোমার জাগতিক ও বাহ্যিক গৃহের সকলকে এ প্লেগের আক্রমণ হতে রক্ষা করব। এ খবরের ভিত্তিতে হযরত (সঃ) নিজ কিতাব কিস্তিয়ে নূহ-এ নিজ জামাতের সকলকে প্লেগের প্রতিশোধক কোন টীকা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন যেন এই ঐশী নিদর্শন অস্পষ্ট হয়ে না যায়। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বড় জোরালো ভাষায় সারা পৃথিবীতে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। একবার বলেছিলেন, 'আমার গৃহের ভেতরে যদি একটি ইদুঁরও প্লেগে মরে যায় তাহলে আমার দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী এত জোড়ালোভাবে পূর্ণতা লাভ করেছিল যে, কোন এক মৌলভীও একথা বলতে পারেনি- হযরত আকদস (আঃ)-এর বিরোধিরা মরেনি এবং হযরতের (আঃ) অনুসারী কেউ মরেছে। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, মৃতদেহ দাফনের জন্য লোক পাওয়া যেত না। কোন কোন গ্রামে একজন গায়ের আহমদীও বাঁচেনি- আহমদীরা গিয়ে তাদের লাশ দাফন করেছে। এ সম্পর্কে

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, সেই যুগে এত বেশী বয়াত ফর্ম ডাকযোগে আসত যে, পিওন ক্লান্ত হয়ে যেত ডাক বহন করে আনতে আনতে। কয়েকবার ডাক আনতে হতো। আজ যে যাই বলুক, সেদিন কেউ বলতে পারেনি যে, মির্যা সাহেব! তোমার অনুসারীদের অবস্থাও শোচনীয় হয়েছে।

একবার মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের শরীরে প্লেগের লক্ষণ দেখা গেল। প্লেগের ফোঁড়া শরীরে দেখা দিল। প্রচন্ড জ্বর উঠে গেল। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ) সকল চিকিৎসা করে ব্যর্থ হলেন। মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে পয়গাম পাঠালেন যে, আমার সময় শেষ, আপনি এসে দেখে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সামান্যও চিন্তা করলেন না যে, সত্যিই যদি প্লেগ হয়ে থাকে তাহলে তো তাঁকেও ধরতে পারে প্লেগে। সাথে সাথে হযরত সাহেব মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে দেখতে গেলেন। হযরত সাহেব মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের কপালে হাত রেখে বললেন, "কই জ্বর! কোন জ্বর তো নেই।" সাথে সাথে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের জ্বর এবং প্লেগের সকল লক্ষণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন (রাঃ) উঠে গিয়ে দেখলেন, সত্যিই জ্বর বা প্লেগের লক্ষণ গায়েব। মৌলভী মোহাম্মদ আলী উঠে বসলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইলমে গায়েবের আরেকটি ঘটনা।

একবার হযরত মির্যা ফযল মোহাম্মদ সাহেব হাসীওয়ালা হাফেজ হামেদ আলী সাহেবের থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। 'একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাকে বিদেশে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। একটি নির্ধারিত জাহাজে বসে আমি যাত্রা করলাম। জাহাজ অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করেছিল। এমন প্রচন্ড ঝড়ের কবলে পড়ে গেল সেই জাহাজ। লোকেরা চিৎকার আরম্ভ করে দিল। ক্যাপ্টেন ঘোষণা দিল যে, জাহাজ ডুবে যাচ্ছে সবাই শেষ দোয়া করে নাও।"

আমি জোরের সাথে দাবী করে বললাম, 'দেখ, আমি পাঞ্জাব থেকে এসেছি। আমি এমন এক ব্যক্তির কাজ নিয়ে যাত্রা করেছি যিনি এ যুগে নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। অতএব যতক্ষণ আমি এ জাহাজে আছি আল্লাহ্ এ জাহাজকে ডুবতে দিবেন না।"

আল্লাহ্‌তাআলা অবস্থা পরিবর্তন করেছিলেন। ঝড় থেমে গেল। জাহাজ যথাস্থানে শহরে ভিড়ল। আমি নিরাপদে সেখানে আমার গন্তব্য স্থানে নেমে গেলাম।

এরপর মজার ঘটনা এখন বলছি। জাহাজ অন্যস্থানের জন্য যাত্রা করে কিছুদূর গিয়ে ডুবে গেল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খবর পেয়ে গেলেন যে, সেই জাহাজ তো ডুবে গেছে যাতে হাফেয হামেদ আলী যাচ্ছিলেন। হযরত (আঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি তো যে সেই জাহাজ যাতে হামেদ আলী বসা ছিলেন সেটা ডুবে গেছে।" এরপর হযরত (আঃ) চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত (আঃ) বললেন, "তবে হামেদ আলী ডুবেনি, সে তার কাজ করছে।" পরবর্তীতে ঘটনার খবরে জানা গেল যে, হযরত (আঃ) যা বলেছেন সেটাই ঠিক।'

সম্ভবতঃ হযরত (রাঃ) কাশ্‌ফের মাধ্যমে সমস্ত ঘটনা দেখেছিলেন।

শেখ জয়নুল আবেদীন ও হাফেয হামেদ আলী সাহেব সম্পর্কে রেওয়ায়াত আছে যে, হযরত (আঃ) বলেছেন, 'হামেদ আলী সম্পর্কে আমি ইলহামপ্রাপ্ত হয়েছি যে, হামেদ আলী জীবিত ফেরত আসবে এবং লাভবান হয়ে আসবে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, একবার নওয়াব আলী মোহাম্মদ খাঁন মরহুম লুধিয়ানার রইস, আমাকে পত্র লিখলেন যে, 'আমার কোন কোন উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। দোয়া করুন যেন সেগুলো আবার উন্মুক্ত হয়।" আমি দোয়া করে এলহাম প্রাপ্ত হলাম যে, ওসব পথ খুলে যাবে। আমি পত্র লিখে নওয়াব সাহেবকে জানালাম যে, বন্ধ পথ খুলে যাবে। মাত্র কিছু দিনের পরই নবাব সাহেবের বন্ধ হয়ে যাওয়া উপার্জনের পথ খুলে গেল। নওয়াব সাহেব আমার প্রতি আরো অনুরক্ত হলেন।

আবার একবার তার কোন কোন গোপন বিষয়ে পত্র লিখলেন। পত্র যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পেলেন, তখন আল্লাহ্‌তাআলা নওয়াব সাহেবের গোপন বিষয়গুলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে জানিয়ে দিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জবাবে লিখলেন, যে আপনার এই এই গোপন বিষয় আল্লাহ্ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব কোন কিছু গোপন থাকল না।' তারপর নবাব সাহেব অনেক বেশী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি ভালবাসায় আপ্লুত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এতে কায়েম ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

বারাহীনে আহমদীয়ার যুগে যখন বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশিত হচ্ছিল, আমি একা ছিলাম। কে প্রমাণ করতে পারে যে, সেই সময় আমার সাথে কেউ একজনও ছিল? সেই যুগে আল্লাহ্ আমাকে পঞ্চাশবারেরও বেশি বার খবর দিয়েছিলেন, এক সময় আসছে- তোর সাথে এক দুনিয়া (অসংখ্য মানুষ) হবে। সময় সন্নিকট যখন বাদশাহ্ তোর পোশাক থেকে বরকত খুঁজবে। খোদা বড় পবিত্র তিনি যা করতে চান তাই করেন। তিনি তোমার জামাতী কর্মকান্ডকে, জামাতকে পৃথিবীতে বিস্তৃতি দান করবেন। তাদের মধ্যে বরকত দিবেন, বৃদ্ধি করবেন। তাদের মান-সম্মান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন যতদিন তারা এই অঙ্গীকারের উপর কায়েম থাকবে।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে কাশ্‌ফের মাধ্যমে সেসব বাদশাহ্‌দেরকে দেখানো হয়েছে।"

আমি যখন আফ্রিকা ভ্রমণে গিয়েছিলাম তখন সেখানে ঘোড়ার উপরে বসা বাদশাহ্‌দেরকে দেখেছি। তবে আফ্রিকার বাদশাহ্ তো গরীব দেশের বাদশাহ্! আর হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-কে যেসব বাদশাহ্‌র খবর দেয়া হয়েছিল তারা পৃথিবীর বড় বড় শক্তিশালী বাদশাহ্ ছিলেন।

(ক্যাসেট ধারণকৃত রেকর্ড শুনে অনুবাদ)

অনুবাদ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

পর্ব ৪ ঃ অধ্যায় ঃ ১

ওহী-ইলহামের প্রকৃতি

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

Other Experiences of Sub-conscious বা অবচেতন মনের অন্যান্য অভিজ্ঞতা ঃ

যে সব কাজের মাধ্যমে মানুষের মনোজগতে ভবিষ্যতের কোন ঘটনা বা ভুয়োদর্শন উদ্ভূত হতে পারে তার মধ্যে স্বপ্ন অন্যতম। স্বপ্ন এমন একটি সার্বজনীন বিষয় যে সম্পর্কে সর্ব যুগে বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যাকে মানুষের অবচেতন মনের চিন্তা-ভাবনা প্রসূত একটি বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে আসছে। তবে আজকে স্বপ্ন শুধু ফ্রয়েডের তত্ব Freudian era of Theorization) মতে কোন ব্যক্তি তার প্রাত্যহিক কাজ-কর্মের সমস্যা নিরসনে অবচেতন মনে যে সমধান কামনা করে, তারই একটি প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়ামাত্র নয়, বরং আজ অত্যন্ত আধুনিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে স্বপ্নের স্বরূপ ও প্রকৃত অনুসন্ধানে গবেষণা করা ও এ বিষয়ে তথ্য ও মতামত সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, ধর্মীয় দিক থেকে দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, স্বপ্ন মানুষের অবচেতন মনের একটি প্রতিক্রিয়া, যা ধর্মীয় সীমানা নির্বিশেষে একটি সাধারণ বিষয় এবং কম বেশী সবাই দেখে থাকে। দ্বিতীয়ত, স্বপ্নের একটি ঐশী উৎস আছে (Divine origin) এবং এর রয়েছে গভীর তাৎপর্য (Deeper significance)। এ জাতীয় স্বপ্নে আল্লাহ্ ভবিষ্যতের কোন ঘটনা, বিজয় বা ব্যর্থতার কথা তার মনোনীত ব্যক্তিকে জানান, বা এমন কোন তথ্য অবহিত করেন, যার সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণাই দর্শনকারীর ছিল না (reveal information of which the viewer had no knowledge what soever prior to that particular dream)। এ জাতীয় স্বপ্ন এক অদৃশ্য কিন্তু সচেতন অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে, যিনি এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে যখন চান, যোগাযোগ করেন। ধর্ম-জগতে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কিন্তু যারা ধর্মকে অস্বীকার করেন, তারা স্বপ্নের এ জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে নারাজ। কেননা, এর মাধ্যমে এক অলৌকিক সচেতন স্বত্বার Superhuman Conscious Agency) অস্তিত্বকে স্বীকার করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে, যা একটি শাশ্বত সত্য, কিন্তু যাকে মেনে নিতে জড়বাদী বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের একটি বিরাট অংশ একান্তই বিরাগ (a fact to which a large number of secular thinkers and scientists are extremely allergic)।

কিন্তু এতদসত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মগুরু বা পবিত্রাত্মা ব্যক্তিসমূহের অনেক স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা না করে তাদের নিজেদের স্থূল কল্পনা বা খেয়াল খুশী সংযোজন করে সেগুলোকে এতটাই উদ্ভট বিষয়ে পরিণত করেছেন যে আজকের যুগের বিজ্ঞানীদের পক্ষে সেগুলোর সত্যতাকে স্বীকার করে নেওয়া একটি কষ্টকর ব্যাপার (it is hard for scientists to subscribe to their credulity)। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে অনুসারীদের হস্তক্ষেপ বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অতিরঞ্জনের জন্য (dramatization of the spiritual experiences) একটি সত্য বিষয়কে অস্বীকার করা কতটা যুক্তিযুক্ত? বরং আমাদের প্রচেষ্টা চালানো দরকার যাতে তথাকথিত অনুসারীদের স্থূল কল্পনা বা খেয়াল খুশীর আড়াল থেকে সঠিক তথ্য, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক মহান ব্যক্তিদের আত্মিক অভিজ্ঞতাকে উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অগ্রসর হলে ধর্মের অনেক বিষয় সম্পর্কে আজকের যুগে যে বীতশ্রদ্ধ ভাবের জন্ম হয়েছে, তারও নিরসন হতে পারে।

বিভিন্ন ঐশীগ্রন্থের মধ্যে যেহেতু পবিত্র কুরআনের হিফাযত অর্থাৎ, এর শিক্ষা কোন প্রকার বিকৃতি থেকে সংরক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে, তাই কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমরা বিভিন্ন যুগে প্রদর্শিত কিছু অলৌকিক ঘটনা ও ঐশী নিদর্শনকে পর্যালোচনা করতে চাই। বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে ওই সব অলৌকিক ঘটনাগুলো তো অবশ্যই মো'যেযা ছিল, কিন্তু সেগুলো খোদার প্রাকৃতিক নিয়ম কানুনকে লংঘন না করেই সংঘটিত হয়েছিল (miracles and signs never violate the laws of nature)।

উদাহরণস্বরূপ হযরত মূসা (আঃ) এর যুগে যাদুকরদের সাথে যে মো'যেজা প্রদর্শিত হয়েছিল, তা কুরআনের আলোকে খুবই সহজ, যুক্তি সিদ্ধ ও বাস্তব-সম্মত একটি ব্যাপার হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন ঃ "সে [হযরত মূসা (আঃ) বলিল, তোমরা নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন যাদুকররা নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা লোকদের চক্ষুসমূহকে সম্মোহিত করিল, তাহাদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তাহারা এক মহাযাদু উপস্থাপন করিল। এবং আমরা মূসার (আঃ) প্রতি ওহী করিলাম যে তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর এবং কি আশ্চর্য, উহা যাদুকরদের কুহকী ক্রিয়াকলাপকে গ্রাস করিতে লাগিল, যাহার ফলে সত্য প্রকাশিত হইল এবং যাদুকরদের প্রতারণা মিথ্যারূপে সাব্যস্ত হইল।" (আরাফ ঃ ১১৭-১১৯)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে যে ফেরাউনের যাদুকরবৃন্দ দড়ির উপর নয়, বরং লোকদের চোখের উপর তাদের সম্মোহনী শক্তি প্রয়োগ করে (a clear description of mesmerism)। আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি যাদুকরদের ভেল্কির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। কোরান শরীফ এটা বলে না যে মূসার (আঃ) লাঠি সাপ হয়ে যায়, বরং মন্মোহনের প্রভাবে যাদুকরদের যেসব দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হচ্ছিল, মূসার (আঃ) লাঠির আঘাতে তাদের যাদুর কৌশল বের হয়ে পড়ে। (চলবে)।

অনুবাদ অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে?

মূল ঃ মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ, লন্ডন

(৭ম কিস্তি)

কুরবানীর ব্যাপক ক্ষেত্র

জামাতে আহমদীয়া সারা বিশ্বে একটি মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের নিশানবাহী আন্দোলন। ইতিহাস সাক্ষী, মানবের সংশোধনের খাতিরে যত আন্দোলন হয়েছে একে সবসময় কুরবানী করতে ও ধৈর্যের পরীক্ষার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে।

আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর (সঃ) নিবেদিত প্রাণ সাহাবাগণ এক্ষেত্রে যে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন এ দৃষ্টান্তকে আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে আহমদীয়া জামাত এ যুগে পুনরায় জীবিত করে দিয়েছে।

কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ সবচে' মহান কুরবানী। জীবনরূপ সম্পদ প্রতিটি মানুষের কেবল একবারই লাভ হয়ে থাকে। আর এটা তার সবচে' প্রিয় জিনিস। এর কুরবানী যেন কুরবানীর সেরা। জামাতে আহমদীয়ার এ বৈশিষ্ট্য লাভ হয়েছে যে, এক্ষেত্রেও এটা সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে জীবিত করে দেখিয়েছে আর বাস্তবেও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আখারীন বা অন্য মু'মিনদের যুগে সাহাবাদের মসীল ও সদৃশ এ জামাতই।

প্রাণোৎসর্গের কথা এলেই মাথায় প্রথমে হযরত মিঁয়া আবদুর রহমান সাহেব (রাঃ)-এর নাম আসে। তাঁর আহমদীয়ত গ্রহণ করার কারণে আফগানিস্তানে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। মরহুমের গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে খুবই নিদারুণভাবে তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়। তিনি আহমদীয়তের প্রথম শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর পরে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রাঃ) অসাধারণভাবে স্থৈর্য ও মর্যাদার সাথে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এ উভয় বুযুর্গ মানুষের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর পবিত্র হাতে লিখেছেন আর বলেছেন,

"হে আব্দুল লতীফ! তোমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ যে, তুমি আমার জীবদ্দশায়ই তোমার সত্যবাদিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছো।' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, খন্ড ২০, তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতায়ন, পৃষ্ঠা ৬০)

হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ (রাঃ) জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও খোদা-ভীতির কারণে কাবুলের ভূমিতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হাজার হাজার লোক তাঁর অনুসারী ছিল। তিনি রাজ্যের বাহু ছিলেন। এবং কাবুলের আলেমদের মাঝে দিবাকরের মত বিরাজ করতেন। যখন তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা বুঝে-শুনে গ্রহণ করলেন এবং আফগানিস্তানে ফেরত গেলেন তখন তাঁকে এ অপরাধে গ্রেফতার করা হলো। ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের কষ্ট ভোগ করেন। জেলে ১ মন ২৪ সের ওজনের শিকলে তাঁকে বাঁধা হলো। পায়ে ৮ সের ওজনের বেড়ি পড়ানো হলো। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার জায়গীরের মালিক ছিলেন এবং আরাম-আয়াস লালিত-পালিত হয়েছিলেন। এসব দুঃখ-কষ্টকে খুবই স্থৈর্যের সাথে সহ্য করেন। আমীর তাঁকে বারবার আহমদীয়ত পরিত্যাগ করার জন্য প্রলুব্ধ করেন। সম্মানের সাথে মুক্তি ও পুরষ্কার এবং মর্যাদাদানের অঙ্গীকার করেন, কিন্তু কোন লালসা ও কোন অঙ্গীকার তাঁর স্থৈর্যকে সামান্যও টলাতে পারে নি। তিনি ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়। প্রত্যেক বারেই তাঁর জবাব এটাই ছিলো- "আমি ঈমানের ওপরে পৃথিবীকে প্রাধান্য দিই আমার কাছে এমনটি আশা করো না। যাঁকে আমি নিজে সনাক্ত করেছি এবং সব রকমের প্রশান্তি লাভ করেছি আর তাঁকে মৃত্যু ভয়ে অস্বীকার করবো এটা কি করে হতে পারে? এ অস্বীকার তো আমার দ্বারা হবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এজন্যে কয়েক দিনের জীবনের জন্যে আমা দ্বারা এই বেঈমানী হবে না যে, আমি প্রমাণিত সত্যকে ছেড়ে দেই। আমি জীবন দিতে প্রস্তুত আর সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে, সত্য আমার সাথী হবে" (রূহানী খাযায়েন লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়েন, পৃষ্ঠা ৫২)।

আর পরিশেষে সেই দিন এসে গেলো, আজ থেকে ঠিক একশ' বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৪ জুলাই, ১৯০৩ যখন এ বুযুর্গ ও খোদার শ্রেষ্ঠ পুরুষের ওপরে কুফরী ফতওয়া লাগিয়ে দেয়া হলো। নাকে ছিদ্র করে রশি ঢুকিয়ে দেয়া হলো আর এভাবে একটি পশুর ন্যায় টেনে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। কত ব্যথাপূর্ণ দৃশ্য ছিল! জালেমরা এ নিষ্পাপ মানুষটির ওপরে সব দিক থেকে গালি-গালাজ করতে লাগলো এবং অভিশাপ বর্ষণ করতে লাগলো। তখন ফিরিশ্‌তারা আকাশ থেকে এ বুযুর্গ মানুষটির স্থৈর্য মাহাত্ম্যের উপরে স্বাগতম স্বাগতম বলতে ছিলেন। তিনি এমনই সুদৃঢ় পাহাড় সদৃশ ছিলেন যে, কোন লালসা বা ভয় তাঁকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। জালেমরা এ নিষ্পাপ মানুষটিকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে দিলো আর পরে সবদিক থেকে পাথর বর্ষিত হতে লাগলো এবং দেখতে দেখতে এ পবিত্র পুরুষ পাথরের স্তরের নীচে চাপা পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শহীদ মরহুম শাহাদতের পেয়ালা পান করে অনন্ত জীবন লাভ করলেন। নিজের প্রাণ দিয়ে সাহস ও স্থৈর্যের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে এ দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন যে, কিভাবে ঈমান ও সত্যের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।

শাহাদতের যে প্রদীপ এ শহীদ মরহুম জ্বালিয়ে গেলেন তা আহমদীয়তের ইতিহাসের প্রত্যেক পর্যায়কে আলোকিত করছে। আজ পর্যন্ত ২১০ এর বেশি এমন পবিত্র সত্তা এ পথে চলে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন। আকাশে আহমদীয়তের তারকারাজি সদৃশ এ সৌভাগ্যবান জীবিত লোক রয়েছে যাঁরা আহমদীয়তের সত্যতার ওপরে নিজেদের পবিত্র রক্ত দিয়ে মোহরাঙ্কিত করে গেছেন এবং অনন্ত জীবন লাভের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন।

শাহাদতের মর্যাদা প্রাপ্তদের সাথে সাথে আসীরানে রাহে মাওলা (আল্লাহ্‌র পথে বন্দীগণ)-ও এ পবিত্র পথের যাত্রী। এ পথে বন্দীদের স্থৈর্যও একটি কারামাত (অলৌকিক কর্ম)। একটি মহান নিদর্শন

আর আহমদীয়তের সত্যতার প্রমাণ। এসব নিষ্পাপ লোকদেরকে খুবই নির্মমভাবে বন্দী বানানো হয়। কিন্তু খোদার এ বান্দার হাত কড়াকে চুম্বন করে আল্লাহ্‌র পথে তাদের সে ভাগ্যই লাভ হয়েছে। আল্লাহ্‌র পথে ধৈর্য ও স্থৈর্য প্রদর্শনকারী ও যুলুম-নির্যাতনে হাসিমুখের অধিকারী ও বুদ্ধিমান লোক আহমদীয়ত ছাড়া কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

ইসলামের তবলীগের উদ্দীপনা ও কুরবানী

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের একজন সাহাবী মৌলভী ফতেহ দীন ধরমকোটি সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকতাম। আর কয়েকবার রাতেও হুযূর (আঃ)-এর কাছে অবস্থান করতাম। একবার আমি দেখলাম, আধা-রাত আসার কাছাকাছি সময়ে হযরত সাহেব (রহঃ) অনেক বিচলিত অবস্থায় উদ্বিগ্ন হলেন। আর এক কোণ থেকে অন্য কোণে ছটফট করে পায়চারি করছেন। যেভাবে মায়েরা অস্থির হয়ে ছটফট করে বা কোন রোগী প্রচন্ড ব্যথায় ছটফট করতে থাকে। আমি এ অবস্থা দেখে খুবই ভয় পেয়ে গেলাম আর অনেক চিন্তিত হলাম। আমার মনে এমন এক ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, তখন অস্থিরতার অবস্থায়ই শুয়ে থাকলাম। এমন কি যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সেই অবস্থা দূর হতে লাগলো। সকলে হুযূর (আঃ)-এর কাছে এসে এর উল্লেখ করলাম। রাতে আমি এ ধরনের দৃশ্য দেখেছি। হুযূরের কি কোন কষ্ট হচ্ছিলো বা পেটে ব্যথা এ ধরনের কোন ব্যথা ছিলো? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বল্লেনঃ

"মিঁয়া ফতেহ্ দীন তুমি কি সেসময় জেগে ছিলে? আসল কথা এই যে, যখন আমাদের ইসলামের অভিযানের কথা স্মরণে আসে আর ইসলামের ওপর যে যে বিপদ-আপদ আসছে এর কথা মনে হয় তখন আমাদের মন বেশি অস্থির হয়ে যায়। আর এটা ইসলামের জন্যেই দরদ। এটা আমাদেরকে বিচলিত করে ফেলে" (সীরাতুল মাহ্‌দী, কাদিয়ানে মুদ্রিত ১৯৩৯, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯)।

সেই বরকতপূর্ণ সত্তার এ অবস্থা ছিল। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। দিন-রাত ইসলামের সেবায় কাটিয়ে দেয়া সত্ত্বেও রাতে এ রকম অস্থির অবস্থায় কাটাতেন। তিনি বলেছেন,

"আমাদের ক্ষমতা হলে আমরা ভিক্ষুকের মত ঘরে ঘরে গিয়ে খোদাতাআলার প্রকৃত ধর্মের প্রচার করি আর এ ধ্বংসকারী শির্‌ক ও কুফরী থেকে পৃথিবী ছেয়ে আছে এমন লোকদেরকে রক্ষা করি। খোদা যদি আমাদেরকে ইংরেজী ভাষা শিখিয়ে দেন তাহলে আমরা স্বয়ং ঘুরে ঘুরে এবং সফর করে তবলীগ করি আর এ তবলীগে জীবনপাত করি। এমনকি এ পথে মারাই যাই না কেন" (মলফূযাত, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, ৩য় খন্ড, ২৯১-২৯২)।

তাঁর (আঃ) গোটা জীবন এ আবেগ অনুযায়ীই কেটে গেছে আর তিনি ইসলামের সেবার প্রত্যেক পথে পদচারণা করে ইসলামের তবলীগের প্রতিটি পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং সবচে' অধিক এ আবেগ ও উদ্দীপনাই নিজ জামাতেও এমনভাবে সৃষ্টি করে গেছেন যে, ধর্মের সেবার উদ্দীপনাই জামাতের পরিচিতিতে পরিণত হয়ে গেছে। আহরারী চিন্তাবিদ চৌধুরী আফযল হক সাহেব জামাতে আহমদীয়ার ইসলাম প্রচারের উদ্দীপনা ও তবলীগের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ব্যাপারে লিখেছেন ঃ

"মুসলমানদের অন্যান্য ফিরকার মাঝে তো কোন জামাত তবলীগের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হতে পারেনি অবশ্য মুসলমানদের অসফলতায় ব্যথিত হয়ে একটি হৃদয় দূরে দাঁড়িয়েছে, ছোট একটি জামাত নিজের চারিদিকে একত্র করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে এগিয়ে আসছে ... নিজেদের জামাতে তারা প্রচারের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে চলেছে। এটা কেবল মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকার জন্যে অনুকরণীয় নয় বরং বিশ্বের সকল প্রচারক দলের জন্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ।" (ফিতনা ইরতিদাদ আওর পলিটিকাল কুলাবাজিয়াঁ, প্রণেতা চৌধুরী আফযল হক, মুদ্রিত কো অপারেটিভ স্টিম প্রেস, ওয়াতন বিল্ডিং, লাহোর, পৃষ্ঠা ৪৬)।

এ প্রচারণার উদ্দীপনা সম্বন্ধে অন্যরাও অবহিত। আসলে এটা জামাতে আহমদীয়ার বিরল বৈশিষ্ট্য। জামাতে আহমদীয়া যে ব্যাপকতা, জাঁকজমক, স্থায়িত্ব ও সফলতার সাথে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র অভিযান সারা বিশ্বে চালু রেখেছে এর দৃষ্টান্ত কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। ইসলামের তবলীগের আবেগ এ জামাতের স্বভাবে নিহিত। আর প্রতিটি অন্তরে এর উদ্দীপনা ও ভালবাসা অনুভব করা যায়। এটা সেই মহান ঈমানের সম্পদ। এটাই আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। ধর্মের সেবা ও ইসলামের প্রচারের বিরল আবেগ-এর দৃষ্টান্ত আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে।

সারা বিশ্বে ইসলামের তবলীগ করা কোন পুতুল খেলা নয়। এ পথে প্রাণ, ধন, সময়, সম্মান ও আরাম-আয়েশ সব কিছুর কুরবানী দিতে হয়। আর জামাতে আহমদীয়ার এটা সৌভাগ্য, একে খোদাতাআলা প্রত্যেক যুগে এমন নিষ্ঠাবানদের দান করেছেন, যারা এ কল্যাণমন্ডিত পথে চলার এমন সংকল্প নিয়ে ঐকান্তিকতার সাথে এগিয়ে এসেছে আর নিজেদের জীবন যুগ-খলীফার সমীপে উপস্থাপন করে দেয়। জীবন উৎসর্গী-কৃতদের এ সৌভাগ্যবান দল তাদের নিঃস্বার্থ কুরবানী ও দিন রাতের পরিশ্রমে কুফরীর অন্ধকার এলাকায় ইসলামের প্রদীপ জ্বালিয়েছে। ইসলামের সাহসী বীরেরা, প্রচন্ড রোদে, ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত পায়ে হেঁটে গ্রামে-গ্রামে গিয়ে এক-অদ্বিতীয় খোদার বাণী পৌঁছিয়েছে। আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে গাছের পাতা খেয়ে দিন কাটিয়েছে। শত্রুদের হাতে মার খেয়েছে। পাথর ও খঞ্জরের আঘাতে জর্জরিত হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের লক্ষ্যস্থল বানানো হয়েছে। কিন্তু সর্বাবস্থায় তবলীগের পতাকা সমুন্নত রেখেছে। বরফ শীতল জেলে পুরে তাদের সামনে শূয়রের মাংস রাখা হয়েছে। মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে কয়েক টুকরা রুটি ও পানি পান করে দিন কাটিয়ে দিয়েছে। এমন সব বীভৎস ঘটনা রয়েছে যা শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এসব কিছু ঘটেছে কিন্তু আহমদীয়তের এসব বীর সন্তানেরা সর্বাবস্থায় ইসলামের বাণী পৌঁছাতে রয়েছেন। বিশ্বস্ততা ও প্রেমের এসব কাহিনী শেষ হবার নয়। এদের মাঝে কেউ কেউ এমনও ছিলেন যারা বিয়ের পরে যুবতী স্ত্রীকে একাকী রেখে অন্য দেশে চলে

গেছেন। অনেক দিন পরে ফিরে এসেছেন তো যুবতী স্ত্রীর ওপরে বার্ধক্য ছেয়ে গেছে। কেউ কেউ এমনও ছিলেন যারা ছোট ছোট সন্তান রেখে গেছেন অনেক বছর পর ফিরে এসে নিজ সন্তানকেই চিনতে পারেন নি। অবশ্য এসব মুজাহেদগণের মাঝে এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তিও ছিলেন যারা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ছেড়ে তবলীগের জন্যে রওয়ানা দিয়েছেন এবং ভিন্ন দেশে গিয়ে শুনেছেন- পিতা-মাতা এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এমন কোন কোন সাহসী মুজাহেদও ছিলেন যারা নিজের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ইসলামের কলেমার নাম সমুন্নত করার জন্যে চলে গেছেন। আর কখনও দেশে ফিরে আসেন নি। সেই জেহাদে কবীর নিজের প্রাণের উপহার উপস্থাপন করেছেন আর আজ পর্যন্ত সেই ভূমিই তাদের শেষ বিশ্রামস্থল হয়ে রয়েছে। কুরবানীর এসব কাহিনী, কুরবানীর এসব সত্য দৃষ্টান্ত আর প্রেম ও বিশ্বস্ততার এ জীবিত দৃষ্টান্ত এ যুগে কেবল আহমদীয়তের মাঝেই পরিদৃষ্ট হয়।

আত্মত্যাগ ও নির্ভীকতার এসব কাহিনী এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং এমন সব মুজাহিদও আল্লাহ্‌তাআলা আহমদীয়তকে দান করেছেন যারা অবসর গ্রহণের পরে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এমন ডাক্তার রয়েছেন যারা বছরের পর বছর চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানবতার সেবা করেছেন। এমন শিক্ষক রয়েছেন যারা জ্ঞানের আলোকে বিশ্বকে আলোকিত করছেন। আর এখন আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে ওয়াকেফীনে নওদের এক মহান বাহিনী কার্যক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এরা ইসলামের সেই ছোট্ট-ছোট্ট প্রেমিক যাদেরকে তাদের পিতামাতা তাদের জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করেছেন আর ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে জামাতের কাছে সোপর্দ করেছেন। যুগ-খলীফা ১৯৮৭ সনে ৫,০০০ ওয়াকেফীনে নও-এর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। আহমদী পিতামাতা উৎফুল্ল চিত্তে এ তাহ্‌রীকে 'লাব্বায়েক' বলেছেন। আজ সেই মুজাহেদীনের সংখ্যা আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে ২৬,৩২১ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করার এ ক্রমাগত ব্যবস্থাপনাও আরেকটি মহান দান। এটাও আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। কেউ বলুক, এভাবে নিজের সব কিছু দিয়ে জান্নাত ক্রয় বিশ্বের আর কোথায় আছে?

দোয়ার গ্রহণীয়তার তত্ত্ব-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

দোয়ার কবুলিয়ত বা গ্রহণীয়তা আল্লাহ্‌তাআলার সত্তার একটি প্রমাণ আর মু'মিনের ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যমও বটে। আহমদীয়ত বিশ্ববাসীকে এ সুসমাচার শুনিয়েছে যে, আমাদের খোদা এক জীবন্ত খোদা। তিনি বান্দাদের দোয়া শুনে থাকেন আর এগুলোর উত্তরও দিয়ে থাকেন। আবার দোয়ার গ্রহণীয়তার সুমিষ্ট ফল দান করে থাকেন। যে চ্যালেঞ্জ, প্রতাপ ও দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে আহমদীয়ত এ কথাকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছে এবং যে সংখ্যা ও ধারাবাহিকতায় বিশ্বে আহমদীয়তের দোয়ার কবুলিয়তের জীবন্ত নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে এর দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আহমদীয়তই সারা বিশ্বে দোয়ার কবুলিয়তের প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান দান করেছে এবং এর তাজা তাজা বিকাশের দৃষ্টান্ত এত অধিক সংখ্যায় দেখিয়েছে যে, এর গণনা সাধ্যাতীত। সত্য কথা তো এই, আজ বিশ্বে কোন আহমদী পরিবার এমন নেই যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দোয়ার কবুলিয়তের সাক্ষী নয় বা অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। দোয়ার ওপরে প্রকৃত বিশ্বাস ও দোয়ার কুবলিয়তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তো প্রত্যেক আহমদীর জীবনের অংশে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে প্রত্যেক আহমদী এ-পথে পরিচিত। আহমদীয়তের জগতে যে ভালবাসা ও উদ্দীপনা আর ধারাবাহিকতার সাথে প্রত্যেক ঘরে দোয়া এবং এর কবুলিয়ত ও উপকারীর আলোচনা চলে অবশিষ্ট সারা বিশ্বে সম্মিলিতভাবেও এতটা আলোচনা চলে না। কেবল পুরুষ ও নারীই নয় ছোটরাও এর স্বাদের সাথে পরিচিত। নিঃসন্দেহে দোয়ার এ অবস্থা, এর তত্ত্ব-জ্ঞান ও এতটা অভিজ্ঞতা বিশ্বের অন্য কোন জামাতের এ রঙ্গে সৌভাগ্য ঘটে নি।

দোয়া কী? আর এর প্রভাবসমূহ ও কল্যাণ কী? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তত্ত্ব-জ্ঞানপূর্ণ কথায় শুনুন। তিনি (আঃ) বলেন ঃ

"ওটা বিগলিত করে, ওটা কোমল করে দেয় এমন আগুন। ওটা করুণা আকর্ষণকারী এক চৌম্বকীয় আকর্ষণ। ওটা মৃত্যু বিশেষ। পরিশেষে এক জীবন দান করে। ওটা প্রবল এক বন্যা, পরিশেষে নৌকায় পরিণত হয়। প্রত্যেক বিশৃঙ্খল বিষয় এতদ্দ্বারা সুশৃঙ্খল হয় আর প্রত্যেক বিষ পরিশেষে প্রতিশেধকে পরিণত হয়ে যায় ... মোটকথা, দোয়া সেই মহৌষধ যা এক মুষ্টি মাটিকে পরশ পাথর বানিয়ে দেয়। ওটা এক প্রকার পানি যা অভ্যন্তরীণ আবর্জনাকে ধুয়ে ফেলে। এ দোয়ার সাথে আত্মা বিগলিত হয় আর পানির মত বহমান হয়ে আল্লাহ্‌র আস্তানায় অবনত হয়" (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, ২০ খন্ড, লেকচার সিয়ালকোর্ট, পৃষ্ঠা ২০-২১)।

আবার তিনি বলেন,

"দোয়ার প্রভাব আগুন ও পানির চেয়ে বেশি। বরং ঔষধের উপকরণের মাঝে দোয়ার মত কোন কিছু এমন মহান প্রভাব রাখে না" (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত ১৯৮৪, খন্ড, বারাকাতুদ্দোয়া, পৃষ্ঠা ১১)। (চলবে)

অনুবাদ **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

দোয়ার আবেদন

সিলসিলার বিধি মোতাবেক খাকসার জুন ৩০, ২০০৪ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছি। বিগত ১৮ বছর ধরে পাক্ষিক আহমদী ও পরে আহমদী বুলেটিনের সাথে কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে সেবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে কোন কোন রোগে ভুগছি। আপামর আহমদী ভাই-বোনদেরকে সালাম জানিয়ে শারীরিক সুস্থতার জন্যে এবং জীবনের শেষ দিনগুলো কোন না কোনভাবে যেন জামাতের সেবা করে যেতে পারি সেজন্যে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
প্রাক্তন সম্পাদক
আহমদী বুলেটিন

আমার স্মৃতিতে তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

বিগত ১৯৬৩ইং সনের ৩রা নভেম্বর তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সালানা জলসায় বিরুদ্ধবাদীগণ নির্মমভাবে হামলা করিয়া আমাদের দুই মুখলেস মু'মিনকে শহীদ করিয়াছিল। বহু মু'মিনকে আহত করিয়াছিল। শহীদের মধ্যে একজন ভাই উসমান গনি অবিবাহিত ছিলেন। তাহার ভাই-বোনেরা জামাতের অতি মুখলেস নিষ্ঠাবান কর্মী।

২য় শহীদ তারুয়ার মরহুম আব্দুর রহীম। এই নিষ্ঠুর হামলায় তারুয়ার অনেকে আহত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গুরুতর আহত ছিলেন তারুয়ার বৃদ্ধ ২য় বয়াত গ্রহণকারী প্রবীন আহমদী মরহুম মুন্সী আউছাফ আলী সাহেব। তাঁহার কপালের হাড় ভাঙ্গিয়া ক্ষত সৃষ্টি হয় ও ক্ষতস্থানটি ছিল তাঁহার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার মহাদান। পরম উপহার-তিলক। তিনি কপালের এই আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই আস্তে আস্তে নিস্তেজ হইয়া ১৯৬৫ সনের জানুয়ারী মাসে মৌলার দরবারে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন।

২য় আহত ছিল তারুয়ার মোল্লা পাড়ার সবজা আলী মিয়া। তিনি পরে এই আহত হওয়ার জন্য অতি আনন্দিত ছিলেন। ৩য় আহত ছিল ডাঃ আবুল কাশেম। তিনি তাঁহার মাথায় যখম লাভ করেন ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকনাথ ট্যাংকের দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ের মাটি সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। আর তিনি দোয়া করিতেন এই রক্ত স্রোত দ্বারা যেন আহমদীয়তের জমিন উর্বর হয়।

তারুয়ার উদীয়মান শিক্ষিত যুবক মরহুম ছায়েদুল হাসান, তিনিও আহমদীয়তের জমিনে রক্ত দানের জন্য গর্বিত ছিলেন। তারুয়ার অনেকেই আহত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও অনেক স্থানের অনেক ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জমিন।

মরহুম শহীদ আব্দুর রহীমের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে সকলেই জীবিত। * বড় ছেলে মোঃ মুছলেম মিয়া ওয়াপদায় চাকুরী করে। ২য় ছেলে রোস্তম মিয়া বর্তমানে ইউরোপের বেলজিয়াম নগরে হুযূরের তত্ত্বাবধানে আছে। মেয়েরা বিবাহিত; তাহাদের সন্তান -সন্ততি আছে তন্মধ্যে শালগ্রামের মোয়াল্লেম শাহ্ আলম তাহার বড় মেয়ের পক্ষের নাতী। রোস্তম মিয়ার মাত্র এক মেয়ে বর্তমান রিকাবী বাজারে তার মায়ের সাথে বাস করে ও লেখাপড়া করে। তাহারা সকলেই জামাতের সকলের খেদমতে দোয়া প্রার্থী।

তারুয়ার মাটিতে অনেক বড় বড় বাহাস বা মোবাহাসা হইয়াছে। তাহার মধ্যে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইতেছে। ১ম মোবাহাসা হয় ১৯১৫ সনের নভেম্বর মাসে তারুয়ার পূর্ব পাড়ার মরহুম মুন্সী মাহমুদ আকবর সাহেবের মসজিদ প্রাঙ্গনে। ইহার বর্ণনা পূর্বে করা হইয়াছে। ২য় বাহাস অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাড়া মরহুম ছায়মুল্লা সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে। সেখানে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে আয়াত তুলিলে তাহার আয়াত-সমূহের জওয়াব না দিয়া নানান তাল-বাহানা ও বাজে কথা আওড়াইয়া আহমদীগণ হারিয়াছে বলিয়া আওয়াজ তুলিলে তারুয়ার সচেতন মানুষ মৌলানার সাথে সায় না দেওয়াতে বাহাস এখানে শেষ হয়। এই বাহাস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৭ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে।

৩য় মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ইং সনের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে। তারুয়া আহমদীয়া মসজিদের সম্মুখের নীচের জমিনে ৪র্থ বাহাসটি অনুষ্ঠিত হয় মরহুম এডভোকেট আবদুর রৌফ সাহেবের বাংলা ঘরের সামনে। ১৯৩৭ইং সনের মার্চ মাসে।

পূর্বে বলা হইয়াছে প্রথম মোবাহালার আহমদীগণের পক্ষে মুনাযের ছিলেন ভারতের বিহার প্রদেশের মুঙ্গের শহরের মৌলানা হেকিম খলিল আহমদ সাহেব ও অ-আহমদীগণের পক্ষে মুনাযের ছিলেন কুমিল্লা শহরের গিলাতলা গ্রামের মৌঃ মোহাম্মদ হাছান আলী সাহেব।

২য় মুনাযারা যাহা পশ্চিম পাড়া ছায়মুল্লা সাহেবের বাড়ীর পুষ্করিণীর পাড়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে অ-আহমদীগণের পক্ষে মোনাযের ছিলেন ঢাকা জিলার সররাবাদ মাদ্রাসার মৌলানা সামসুজ্জামান সাহেব ও মৌঃ আঃ মজিদ সাহেব। আহমদীগণের পক্ষে মুনাযের ছিলেন মরহুম মৌঃ ওয়াজের উদ্দিন ও মৌঃ হায়দার আলী সাহেবদ্বয়। প্রথমে আহমদীগণের পক্ষে ইহতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে কুরআনে পাক হইতে প্রমাণ করিয়া, তাহাদের নিকট ঈসা (আঃ) জীবিত থাকার প্রমাণ চাওয়া হইলে সেই পক্ষের আলেম ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার কোন দলিল -প্রমাণ না দিয়া বাজে কথা আওড়াইয়া কাদিয়ানীগণ হারিয়াছে এই বলিয়া গন্ডগোল আরম্ভ করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিল – যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। তখন সভায় কিছু কিছু লোক প্রশ্ন তুলিয়াছিল, কাদিয়ানীরা হারিয়াছে তবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে ২ হাজার বৎসর জীবিত আছেন তার কি হইয়াছে? অনেকে বুঝিতে পারিয়াছিল, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে জীবিত থাকার ও পুনঃ এই পৃথিবীতে আগমনের কোন প্রমাণ মৌলানাগণ দেন নাই বা দিতে পারেন নাই।

তখন আমি মাদ্রাসায় পড়ি। আমার উস্তাদগণের সহিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও জীবিত থাকা নিয়া প্রশ্ন বা আলাপ-আলোচনা করিলে অনেকেই আমাকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। আমি ভালভাবে বুঝিয়া ছিলাম যে, ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার কোন দলিল-প্রমাণ কুরআন পাকে নাই। হযরত ঈসা (আঃ) সশরীরে আকাশে যাওয়া ও আকাশ হইতে আসিয়া উম্মতে মুহাম্মদীয়ার শেষ জামানায় তাহাদের দুরাবস্থা দূর করিবে, এই কথার কোন প্রমাণ কেহই কুরআন পাক হইতে পেশ করিতে পারিবে না। (চলিবে)

ডাঃ আহমদ আলী

** টীকা ঃ লেখক যখন লেখাটি লেখেন তখন শহীদ আব্দুর রহীমের সন্তানেরা সবাই জীবিত ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে ২/৩ বছর পূর্বে গত হয়েছেন।*

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসীদের সীমা

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই।' (কারণ) 'সুপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে; (সূরা বাকারা, ২৫৭ আয়াত)। ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ না করতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা সত্য বিভ্রান্তি হতে সুস্পষ্টরূপে পৃথকভাবে বিরাজমান। অতএব, বলপ্রয়োগের প্রয়োজনই বা কি? ইসলাম দেদীপ্যমান সত্য।

কুরআনে বলা হয়েছে, লাকুম দিনকুম ওয়ালিয়া দ্বীন। অর্থ ঃ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন (সূরা আল্ কাফিরূন, ৭ আয়াত)। মু'মিনগণের জীবন ব্যবস্থা ও তাদের ধর্মের সাথে কাফিরদের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের কোনই মিল নেই এবং যেহেতু এতদুভয়ের বিস্তারিত বিবরণেও মৌলিক ধারণাতে দুস্তর প্রভেদ বিদ্যমান রয়েছে, সেহেতু এদের পরস্পরের সমঝোতা কোনমতেই সম্ভব নয়। ধর্মের প্রচার ও প্রসারতার জন্য জবরদস্তির কোনও প্রয়োজন নেই। ধর্ম গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্তাআলা পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি যেন সমাজের সংস্কার সাধন করতে গিয়ে, বল প্রয়োগের কোন ধারণাই মনে স্থান না দেন। সংস্কারক হিসেবে তাঁর (সঃ) অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, 'সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক। কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশ দাতা মাত্র, তুমি তাদের জিম্মাদার নও' (সূরা আল্ গাশিয়াহ্ ২২, ২৩ আয়াত)। কিন্তু যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে আমরা তোমাকে তাদের উপরে হেফাযতকারী করে পাঠাইনি। কেবল (সংবাদ) পৌঁছে দেওয়াই তোমার কর্তব্য' (আশ শূরা আয়াত ঃ ৪৯)। আল্লাহ্ বলেন' এবং তুমি বল, এ সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।" (সূরা কাহ্ফ আয়াত ঃ ৩০)। ইসলাম শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার ধর্ম। জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের চূড়ান্ত কল্যাণই ইসলমের মর্মকথা। বাক্-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন মানুষের মর্যাদা পুনঃস্থাপনের জন্য অপরিহার্য তেমনি তা অপরিহার্য কোন বাণীর প্রচারের জন্যও। কোন ধর্মই যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না, যদি না তা নিজে মানবীয় মর্যাদা পুনঃস্থাপন ও সংরক্ষণের কথা বলে। ইসলামের ন্যায় একটি ধর্মের পক্ষে বাক্ স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। বস্তুত ইসলাম এমনভাবে এবং এমন জোরের সঙ্গে এই নীতিকে সমর্থন করে, যা পৃথিবীতে অন্য আর কোন মতাদর্শে বা ধর্মে কদাচিৎ দেখা যায়।

আন্তঃসাম্প্রদায়িক এবং আন্তঃধর্মীয় বিবাদ-বিসম্বাদ মেটানোর জন্য কোনক্রমেই কারো উপর বল প্রয়োগ করা যাবে না এবং নিপীড়ন চালানো যাবে না। ধর্ম-নির্বাচনের এখতিয়ার, তা ঘোষণা করার স্বাধীনতা, এর প্রচার-পালন এবং অনুশীলন করার অধিকার অথবা তা অস্বীকার বা বর্জন বা পরিবর্তন করার স্বাধীনতা নিরঙ্কুশভাবে সংরক্ষিত করতে হবে। প্রতিটি মানুষের এ অধিকারকে স্বীকার করতে হবে যে, তার ধর্মীয় অনুভূতি যেন লঙ্ঘিত না হয়, যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও পবিত্র পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নীতিমালা সমূহের ব্যাপারে আপোষ করতে হবে এমনটি নয়। আসলে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবাইকে উদার হতে হবে। মতপার্থক্যের পরিসর সংকীর্ণ করে ঐকমতের সম্ভাবনা সুপ্রসারিত করার জন্য সবাইকে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সকল ধর্মের অনুসারীদের উচিত হবে অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের স্ব-স্ব ধর্মের বিষয়াদি নিয়ে বিতর্ক সীমিত করে ফেলা। সকল ধর্মের উৎস এক। একই উৎস ধারা থেকে সত্যের স্ফুরণ ঘটেছে। কাজেই মানবজাতিকে একই সত্য ধর্ম গ্রহণ করে একই মোহনায় এসে মিলিত হতে হবে। মানবজাতির পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে সকল ভাল কাজ এবং পরিকল্পনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসাথে মিলেমিশে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা বা কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আর জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষকে একই পতাকার তলে একত্রিত হতে হবে। [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) প্রণীত বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান' গ্রন্থ দ্রঃ]

কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে 'এবং আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনতে পারে না" (সূরা ইউনুস ঃ ১০১ আয়াত)। বলা হয়েছে, "এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনত। সুতরাং তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা মু'মিন হয় ?" (সূরা ইউনুস ঃ ১০০ আয়াত)।

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাউকে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয় নি। ইসলাম এরকম কার্যক্রমকে আদৌ সমর্থন করে না। বরং বলা হয়েছে, "তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সর্বাধিক উত্তম" (সূরা আন্ নাহল ঃ ১২৬ আয়াত)। 'তুমি মন্দকে তার দ্বারা প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম, তারা যা বর্ণনা করে আমরা তা ভালভাবেই জানি' (সূরা আল্ মুমিনুন ঃ ৯৭ আয়াত)।

দুষ্টচক্র ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না" তারা বলে, আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। সতর্ক হও! নিশ্চয় তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা ইহা বুঝে না" (সূরা বাকারাহ ঃ ১২, ১৩ আয়াত)। ইসলামের বাণী হচ্ছে, "আল্লাহ্ কলহ-বিশৃঙ্খলাকারীদের ভালবাসেন না" (২ঃ২০৬)।

"যারা নবী করীম (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করে তারা মূলত আল্লাহ্রই আনুগত্য করে এবং যে কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এমতাবস্থায় আমরা তোমাকে তাদের উপর রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি' (সূরা নিসা ঃ ৮১ আয়াত)। সত্যের অস্বীকারকারী যারা– তাদের উপর উৎপীড়ন চালানো যাবে না।

আল্লাহ্তাআলার নবী ও রসূলগণ পরম স্নেহময় ও হিতাকাঙ্ক্ষী মায়ের ন্যায় মানবের প্রতি অশেষ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করে থাকেন। তারা মানব জাতির জন্য নিদারুণ দুঃখ পান এবং আকুল ক্রন্দন করেন এবং মর্মযাতনায় কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ, যাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্তাআলার নবী-রসূলগণ অধিক কষ্ট পেয়ে থাকেন, তারাই আল্লাহ্র নবীদেরকে নির্যাতন উৎপীড়ন এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করে থাকেন। কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে, "অতএব, যদি তারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহলে কি তুমি তাদের জন্য দুঃখে আত্মবিনাশ করে ফেলবে"? (সূরা কাহ্ফ ঃ ৭ আয়াত)

ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে সকল মুসলমানই সমান অংশীদার। সকলেই তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাজেই সবাইকে প্রীতিময় সম্পর্ক বজায় রেখে শান্তি ও সৌহার্দময় সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখে প্রগতির পথে চলতে হবে। ইসলাম ধর্মে মানুষকে ধর্ম-কর্ম করার ব্যাপারে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। ধর্মের নামে সন্ত্রাসমূলক নাশকতা কাজ করে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি উদ্ভব করা গর্হিত কাজ।

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

কুরআনের একটি আয়াত এবং মাওলানাদের নীরবতা

পবিত্র কুরআন আমাদের জন্য কিয়ামতকাল পর্যন্ত পঠিত গ্রন্থ। এ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী-শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) বিদায় হজ্জের বাণীতে মুসলমানদের বলে গিয়েছেন, "আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি এমন বস্তু যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনই বিভ্রান্ত হবে না। অতি স্পষ্ট বস্তু তা– অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব।"

কুরআন শরীফের সূরা বনী ইসরাঈল এর ১৫নং আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন "আমি কোন (সর্তক করার জন্য) রসূল না পাঠিয়ে আযাব নাযেল করি না।"

উপরোক্ত আয়াতের মর্মকথা হলো, মানুষের উপর কোন আযাব ও গযব নাযেল করার পূর্বে মানুষকে সতর্ক করার জন্য অবশ্যই আল্লাহ্‌তাআলা সতর্ককারী পাঠান। কোন দেশের সরকার যেমন কোন বেআইনী কাজ দমন করার জন্য হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে ভালোভাবে সতর্ক করে দেন তেমনি মহান আল্লাহ্‌তাআলা সমাজ যখন কুলষিত হয়ে পরে, মানুষের মধ্যে যখন তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি কমে যায়, তখন মানুষকে হেদায়তের জন্য, আল্লাহ্‌র শাস্তিকে এড়ানোর জন্য মানুষের কাছে সতর্ককারী পাঠান এভং মানুষের মধ্যে তখন যে জাতি সতর্ককারীর কথা উপেক্ষা করে এবং হেদায়াতের পথে পরিচালিত হয় না তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌পাক আযাব ও গজব নাযেল করেন এবং এর কোন ব্যতিক্রম হয় না।

আল্লাহ্‌তাআলা বিভিন্নভাবে দুনিয়াতে গজব নাযেল করে থাকেন, এর মাঝে ভূমিকম্পও আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ হতে একটি আযাব ও গজব।

গত ২৬শে আগষ্ট ১৯৯৯ইং দৈনিক ইনকিলাবেও ভূমিকম্পকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌পাকের গজব হিসাবে উল্লেখ করেছে। আল্ কুরআনের বঙ্গানুবাদ কলামে [সূরা-হজ্জ, আয়াত ১-২, পারা-১৭, রকূ-১] এর দিক দর্শন ঃ এ ইনকিলাবে লিখেছে- "আল্লাহ্‌পাকের অসংখ্য নিদর্শনাবলীর মাঝে ভূমিকম্পও একটি নিদর্শন। এ ভূমিকম্প আল্লাহ্‌পাকের গজব ছাড়া কিছুই নয়। ... এ মাটির পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র খলীফা' বা প্রতিনিধি। এ প্রতিনিধিরা যখনই আল্লাহ্‌র নাফরমানিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, তখনই তাদের উপর নেমে এসেছে ভূমিকম্পরূপ আল্লাহ্‌র গজব। এর ফলশ্রুতিতে বহু সভ্যতা ও জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ভূগর্ভে বিলীন হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের ফলে এসব সভ্যতা আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌পাক নাফরমান বান্দাদের অন্যান্য আযাব ও গজবের পাশাপাশি ভূমিকম্পের দ্বারাও চরমভাবে শাস্তি দান করেছেন এবং করবেন। এর কোন ব্যতিক্রম হবে বলে আশা করা সার্বিকভাবে বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। (দয়া করে এ অংশটুকু হেফাযত করুন)"

পাঠকগণকে উপরোক্ত মূল্যবান সাবধান বাণী হেফাযত করে রাখার জন্যও বলা হয়েছে। যেন ভূমিকম্পের মত ভয়ঙ্কর গজবকে আমরা স্মরণে রাখি। অন্যদিকে এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুনশী সাহেবও দৈনিক ইনকিলাবের ২৬/৮/৯৯ইং সংখ্যায় লিখেছে "ভূমিকম্প আল্লাহ্‌পাকের গজব" "সত্যিকারভাবে প্রকৃত মুসলমান হোন এবং আল্লাহ্‌র গজব থেকে বাঁচুন। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত উপরোক্ত লেখা ২টি পাঠ করলে পাঠক মাত্রই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন এবং আমার সাথে একমত হবেন যে, ভূমিকম্প হল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মানুষের উপর একটি গজব।

সুতরাং পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত ১৭নং সূরার ১৫নং আয়াত অনুযায়ী এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, ভূমিকম্পের মত ভয়ঙ্কর গজবকে আল্লাহ্‌তাআলা দুনিয়াতে নাযেল করার পূর্বে মানুষকে সতর্ক করার জন্য অবশ্যই একজন সতর্ককারী পাঠাবেন।

নিম্নে ভূমিকম্পের একটি খতিয়ান দেয়া হ'ল ঃ

দেশের নাম	মৃতের সংখ্যা	পত্রিকার নাম
চীনে ভূমিকম্প	১,০০,০০০	জনকণ্ঠ ১৯২০ সাল
জাপানে "	১,৪২,৮০০	জনকণ্ঠ ১৯৩১ সাল
পাকিস্তানে "	৫,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ৩০/৫/৩৫
ইটালিতে "	২,৮০০	দৈঃ ঝং লাহোর ২৬/৬/৩৯
তুরস্কে "	৩,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ২১/১২/৩৯
জাপানে "	১,৩৩০	দৈঃ ঝং লাহোর ২০/১২/৪৬
আফগানিস্তানে "	২,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ১০/৬/৫৬
তুরস্কে "	২,৫২০	দৈঃ ঝং লাহোর ১৯/৮/৬৬
বইরুতে "	৬,৬০০	দৈঃ ঝং লাহোর ৩১/৫/৭০
জাপানে "	১,০০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ০৪/৬/৭০
ইরানে "	৫,০৫৪	দৈঃ ঝং লাহোর ১০/৪/৭২
ফিলিপাইনে "	৮,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ১৬/৮/৭৬
ইরানে "	৫,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ২৪/১১/৭৬
চীনে "	২,৪০,০০০	জনকণ্ঠ ১৯৭৬ সাল
কলম্বিয়ায় "	৮০০	দৈঃ ঝং লাহোর ১২/১২/৭৯
ইরানে "	৩,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ১১/৬/৮০
আল জায়ারে "	৩,৫০০	দৈঃ ঝং লাহোর ১৩/১১/৮০
ইটালিতে "	৩,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ২৩/১১/৮০
কলম্বিয়ায় "	৪,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ৬/৫/৮৭
আর্মেনীয়ায় "	২৫,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ৭/১২/৮৮
ফিলিপাইনে "	১,৬৪১	দৈঃ ঝং লাহোর ১৬/৭/৯০
ইরানে "	৪০,০০০	জনকণ্ঠ ১৯৯০ সাল
পাকিস্তানে "	১,৫০০	দৈঃ ঝং লাহোর ১/২/৯১
ইন্দোনেশিয়ায় "	২,০০০	দৈঃ ঝং লাহোর ১২/১২/৯২
ভারতে "	৩০,০০০	বাংলা বাজার পত্রিকা ২/১০/৯৩
জাপানে "	৫,০০০	বাংলা বাজার পত্রিকা ২৭/১/৯৫
ইরানে "	১,০০০	জনকণ্ঠ ১১/৫/৯৭
আফগানিস্তানে "	৫,০০০	জনকণ্ঠ ১/৬/৯৮
কলম্বিয়ায় "	২,০০০	প্রথম আলো ২৭/১/৯৯
তুরস্কে "	৪০,০০০	ইত্তেফাক ২১/৮/৯৯
তাইওয়ানে "	২,০০০	ইনকিলাব ২৩/৯/৯৯
তুরস্কে "	৩৯৩	দৈঃ ঝং লাহোর ১৪/১১/৯৯
ভারতে "	১৫,০০০	ইত্তেফাক ২৮/১/০১
আফগানিস্তানে "	৫,০০০	জনকণ্ঠ ২৭/৩/০২
ইরানে "	৪০,০০০	ইনকিলাব ২৭/১২/০৩
মরক্কোতে "	৬০০	জনকণ্ঠ ২৬/২/০৪

উপরোক্ত ভূমিকম্পের খতিয়ান হতে নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন জাগা উচিত এত ভূমিকম্প হ'ল, এত মানুষের ক্ষয় হ'ল অথচ পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্‌তাআলা কোন সতর্ককারী পাঠালেন না?

কুরআন শরীফের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা উল্লেখ করেছেন তার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা কোন মু'মিনের পক্ষেই সম্ভব নয়।" যা-লিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহ্। এটা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।" (সূরা বাকারা আয়াত নং ২) রব্বুল আলামীন যা বলেন এর কোন ব্যতিক্রম করেন না। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার বাণী অনুযায়ী মুত্তাকীনদের উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরাই কোন ভুল করছি, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌তাআলা কোথাও না কোথাও সতর্ককারীকে পাঠিয়েছেন। মু'মিনের পরিচয় দিতে এবং অনাগত ভূমিকম্পসহ গজব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদেরকেই সতর্ককারীকে খুঁজে বের করতে হবে. আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ হতে **কে সেই সতর্ককারী?** মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে তাঁর প্রেরিত সেই সতর্ককারীকে চেনার তৌফীক দান করুন এবং আমাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলার আযাব হতে রক্ষা করুন। আমীন। পরিশেষে স্মরণ করি আল্লাহ্‌তাআলার সেই বাণীকে ঃ

"যে কেহ আমাদের সহিত মিলিত হবার বাসনা লইয়া পরিশ্রম সহকারে কাজ করে, আমরা নিশ্চয় তাহাকে পথ প্রদর্শন করি।"

(সূরা আনকবূত ৭০ আয়াত)

এহসান উল আলম

দোয়ার বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণ

যারা দোয়ার বিষয়টির উপর পূর্ণ আমল করে এর প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এর রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন- কেবল তাদেরই এ বিষয়ের উপর কিছু রচনা করা মানায়, অন্যের জন্য এই চেষ্টা তদ্রূপই, যদ্রূপ সাগরে পড়ে কেউ সাঁতরিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। তবে রসূলে করীম (সঃ)-এর অমর বাণী হলো, দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম," এই পুণ্য বাণীর কল্যাণের উপর ভরসা করে এবং ব্যক্তিগত অনুভব ও জামাতী কল্যাণরাজির আলোকে এ বিষয় কিছু লিখার চেষ্টা করব।

দোয়াকে আমরা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, যে পদ্ধতির মাধ্যমে স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধি করত সর্বশক্তিমান লালন ও পালনকর্তার নিকট কিছু যাচনা করে তাঁর প্রিয়ভাজন বলে গণ্য হওয়া যায় এবং তাঁর কাছ হতে কিছু আশীষ লাভ করা যায় মূলত তাকেই বলে দোয়া। আর নামাযই হলো দোয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এ ছাড়া হাঁটায় ও বসায়, ঘরে ও বাইরে, সুখে ও শোকে, যৌবনে-বৃদ্ধে, আঁধারে ও আলোতে, কর্মে ও অবসরে, নীরবে-প্রকাশ্যে, দীনতায় ও ধনাঢ্যে, নেকী-পাপী, বাদশাহ্ ও নফরে সর্বজনে সর্বাবস্থায়ই দোয়া করতে পারে। দোয়া করাই হচ্ছে দোয়াকারীর কাজ, গ্রহণ করা হলো সেই সত্তার কাজ যিনি সর্বশক্তিমান খোদা, যাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যাবে না যে, কেন তার দোয়া কবুল হলো না, যদিও বা কারোর দোয়া কবুল না হয়ে থাকে। এখানে গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখা দরকার যে, কুচিন্তা ও কু-কীর্তি সাধন লক্ষ্যে কখনও দোয়া করা যায় না, তা ঐশী সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। সুতরাং এমন দোয়া না করাই শ্রেয়। কখনও কখনওবা দোয়াকারীর দোয়ার তাৎক্ষণিকভাবে কবুলিয়ত লাভ না-ও হতে পারে, এতে মনঃক্ষুন্ন হওয়ার কোন অবকাশ নেই, নির্দেশও নেই। কারণ দোয়া গ্রহণকারী খোদাই ভাল জানেন কখন কোন্ দোয়া কার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। সুতরাং অসাধারণ ধৈর্যের সাথে দোয়া করে যাওয়াই হচ্ছে দোয়াকারীর কাজ। তবে একথা সত্য যে, পরম দাতার কাছে যাচনা কখনও বিফলে যায় না। যদিওবা কারো দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণীয় হয়নি, তাই বলে সেই দোয়াকারীর দোয়া কখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি বরং তার সেই দোয়া মহান খোদার মহা ভান্ডারে মহাযত্নে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে যা পরবর্তীতে দোয়াকারীর কাজে আসে অথবা তার উত্তরসূরীগণ পর্যন্ত এর ভাগীদার হয়ে থাকে। কারণ খোদা কোন বিষয়েই কারো কাছে ঋণী থাকেন না।

এতক্ষণে হয়ত প্রশ্ন হতে পারে, দোয়ার বৈশিষ্ট্য কি? দোয়া হলো এমন এক গুণ সম্পন্ন যাচনাশক্তি যদ্বারা কোন দোয়াকারী খোদার আরশকে পর্যন্ত কাঁপাতে পারে। চরম শত্রুকেও সে পরম বন্ধুতে পরিণত করতে পারে। রক্তপাতহীন ও প্রাণ নাশ ছাড়াই মহাপরাক্রমশালী মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধ করতে পারে, কপর্দকহীন অবস্থায় ক্ষুধার তাড়না নিয়ে দিব্যি পথ চলতে পারে, কুলকিনারাহীন সংকট মাঝেও কোন দোয়াকারী নিরাপদভাবেই জীবন যাপন করতে পারে প্রাণ হননকারী ঔদ্ধ্যত্ব শত্রুর সামনেও সে তখন মাকড়সার জাল ঝুলিয়ে জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, বলতে কী, দোয়ায় সফলতা অর্জনকারী মানুষগুলো শেষটার এমন অবস্থায় উপনীত হয়ে থাকে যে, তারা তখন অজ্ঞাতসারে তেমনিভাবে উর্ধ্বাকাশে ভাসতে থাকে যেমনিভাবে কোন যাদু বিদ্যা বিশারদ কোন মানুষের দেহকে অবলম্বন ছাড়াই শূন্যাকাশে ভাসিয়ে রাখে। সর্বোপরি সত্য এই যে, দোয়া হলো মানুষের এক পুন্যময় অবলম্বন যদ্বারা কোন মানুষ তার নফসে আম্মারা অর্থাৎ আত্মার অবাধ্যতার স্তর হতে পরিবর্তিত হয়ে, নফসে লাওয়ামা অর্থাৎ তিরস্কারী আত্মার স্তরে গিয়ে উপনীত হয় এবং তৎপর নফসে লাওয়ামার স্তরকে অতিক্রম করে সে তখন নফসে মুৎমাইন্না অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার স্তরে গিয়ে পৌছে। আর যখনই কোন মানুষ তার দোয়ার সফলতার দ্বারা এই মোকাম পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়, তখনই তার প্রতিপালক খোদা তাকে এই বলে আহবান করেন যে, 'হে আমার প্রিয়, শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তাঁর কাছে ফিরে এসো এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি তাঁর সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং তাঁর বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর" (সূরা ফজর ২৮-৩১)।

এটা খোদার এক মহান বিধান যে, যখনই তাঁর কোন বান্দা তার দোয়ার তদবীর দ্বারা এই মোকাম পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয় তখনই খোদা তাঁর এই আহ্বান দ্বারা তাঁর বান্দাকে অভিসিক্ত করেন। সুতরাং এতদসত্ত্বেও যদি কেউ বলে, আগে খোদা তাঁর পুণ্যবান বান্দাগণের উপর ওহী করতেন কিন্তু এখন আর তিনি তা করেন না। আগে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাগণের সাথে কথা বলতেন কিন্তু এখন আর তিনি কথা বলেন না, এমন সব উক্তি জঘন্যতম মিথ্যা, পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত এই আয়াত মোর্টেই তা প্রমাণ করে না। যে বা যারা এ ধরণের অমূলক বাক্য রচনা করত সমাজকে ধোকা দিয়ে বেড়ায় তারা মিথ্যুক, প্রবঞ্চক। তারা খোদার সৃষ্ট হওয়া সত্বেও স্রষ্টাকে ভয় করেনা। বরং খোদার অপার অসীম ক্ষমতাকে তারা সসীমের মাঝে নিয়ে আসতে চায়।

কোন সাধু ব্যক্তি কখনও কল্পনা করতে পারে না। তাছাড়া এখানে আরো সত্য যে, ক্রন্দনাপ্লুত কোন দোয়াকারীর দোয়ার বিনিময়ে খোদা তাকে কেবল এতটুকু নিয়ামত দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে চান না, বরং তিনি ঐ প্রার্থনাকারীকে তাঁর আরশে

সংরক্ষিত বিশেষ চারটি পুরস্কার দ্বারাও তিনি সম্মানিত করেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ কিংবা সালেহ নামক পুরস্কার তিনি প্রদান করে থাকেন, (সূরা নিসা) এরপরও কি কেউ একথা বলার অধিকার রাখেন যে, খোদা তাঁর পবিত্র ভাজনদের সাথে এখন আর বাক্যালাপ করেন না কিংবা পৃথিবীর কেউই আর এখন নবুওয়তের মর্যাদা লাভ করার অধিকার রাখেন না? খোদার এই পবিত্র আশ্বাস কি অজ্ঞদের এই কাল্পনিক উক্তিকে বিশ্বাস করতে বলে? না কি মহান দয়ার দরবার থেকে দোয়ার দ্বারা মহান কিছু অনুদান পাওয়ার আশা দেয়? তাঁর কি কোন গুণ বৈশিষ্ট্য কখনও হ্রাস কিংবা লোপ পেতে পারে? (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর আগমনের পূর্বে অন্য রসূলের উম্মতের জন্য খোদা যেসব পুরস্কার প্রদানের দ্বার খোলা রেখেছিলেন রসূল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর উম্মতের বেলায় কি তিনি সেসব পুরস্কার প্রদানের দ্বার বন্ধ করে দিতে পারেন? আর এটা কি কোন মুসলমানের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব? কখনও নয়। বরং তিনি তাঁর এই প্রিয় রসূলের উম্মতের জন্য এই পুরস্কারের দ্বারকে আরো প্রসারিত করে চিরস্থায়ী করে দিয়েছেন আর অন্যদিকে অন্যসব নবীর অনুসারীদের বেলায় তা তিনি চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন, এটাই হলো ইসলাম ও খাতামান্নাবীঈন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য যা কিনা আর কোন নবী রসূলের নেই। যারা এই মহান বৈশিষ্ট্যের উল্টা ব্যাখ্যা করে নবী শ্রেষ্ঠের উম্মতের মধ্যে নবী আগমনের দরজায় তালা লাগাতে চায়, তারা এই মহান সত্যের মহা বড় শত্রু, তারা স্বার্থলোভী এবং কপট হৃদয়ের অধিকারী। তারা মানুষকে ধোকা দিয়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার ব্যবসায় নিয়োজিত, সুতরাং হে দোয়ার উপর ভরসাকারী ব্যক্তিগণ! আপনারা প্ররোচণার ফাঁদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন এবং আকাশ থেকে আগত সত্যের সন্ধান লাভ করার চেষ্টা করুন, আমি কিন্তু সেই সত্যের বার্তাই ঘোষণা করছি যা প্রতিটি পবিত্র আত্মার একান্ত প্রয়োজন।

এতক্ষণ আমি আমার লেখার মূল বিষয় থেকে একটু সরে গিয়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কয়েকটি কথা বললাম। সে যা-ই হউক, এখন আমি আমার মূল বিষয়ে ফিরে আসছি, আর তা হলো দোয়ার আরো একটি কল্যাণকর দিক হচ্ছে এই যে, দোয়াকারী কখনও দেউলিয়া হয় না বরং কেউ কেউ দোয়া না করে কিংবা তার মর্মগুণ থেকে বিশ্বাস হারিয়ে অথবা দোয়া মঞ্জুরকারীর আহ্বানকে কেউ উপেক্ষা করে সর্বৈবভাবে সর্বনাশে নিপতিত হয়েছেন ভুরি ভুরি এমন নজির রয়েছে। এর মধ্যে নমরূদ, ফেরাউন, আবুজাহেল, আব্দুল্লাহ্ আথম, আলেকজান্ডার ডুই, পন্ডিত লেখরাম, জুলফিকার আলী ভুট্টু প্রমুখ নিদানগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের এই নাম যুগ যুগ ধরেই কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কিত অধ্যায়ে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং আরো বহুকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। যদি কেউ দোয়া করতে গিয়ে এই কথা ভাবেন যে, দোয়া তো করেছি অনেক কিন্তু লাভ তো হলো না কিছুই। আমার ছেলের তো কোন ভাল একটা চাকুরীও হলো না, আমি আমার ব্যবসার দ্বারা অর্থে-প্রাচুর্যে মশহুরও হতে পারিনি, শরীরের রোগ-শোক কিংবা কঠিন বালাই থেকেও তো নিরাময় লাভ করতে পারিনি। সুতরাং খোদার কাছে কান্নাকাটিতে লাভ কি? আমি সেই তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলছি, যারা এমনি ধরণের ভাবনা ভাবছেন, তারা মনে রাখবেন যে, এমনটি ভাবা আপনাদের মোটেই উচিত হয়নি। এটা মোটেই কোন বাঞ্ছিত আত্মার কাজ নয়, তারা বড়ই দুর্ভাগা যারা এমনি ভাবনা নিয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছেন। আসলে আপনারা আল্লাহ্র সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কাজে ব্যর্থ হয়েই এমনটি ভাবছেন। আপনারা শর্ত সাপেক্ষে খোদার অনুকম্পা লাভের চেষ্টা করছেন, দোয়ার দ্বারা দাওয়ার আশা করছেন, এটা মোটেই কোন প্রকৃত দোয়াকারীর কাজ নয়। এক্ষেত্রে এ ধরণের ভাবনা মোটেই কোন পুণ্যের কাজ নয়, বরং তা বুদ্ধিহীনের কাজ।

এখানে আমি একজন আউলিয়ার কথা বলছি, যাঁর নাম হযরত যুন্নুন মিশরী (রহঃ)। তিনি বলছেন, 'আমি একরাতে স্বপ্নযোগে দেখলাম আল্লাহ্ আমাকে বলছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি জগতকে দশভাগে ভাগ করে তাদের সামনে দুনিয়াকে পেশ করলেন, তখন সেই দশভাগের ন'ভাগই ঐ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল, মাত্র একভাগ তার প্রতি আকৃষ্ট হলোনা। অতঃপর খোদা ঐ একভাগকে পুনরায় দশভাগে ভাগ করত তাদের সামনে বেহেশ্তকে উপস্থাপন করলেন এবং তাদের ন'ভাগই সেটা বেহেশ্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল, কিন্তু একভাগ তার প্রতি মোটেই ফিরে তাকাল না, অতঃপর তাদের সামনে দোযখকে এনে দেখানো হলো, কিন্তু তারা তাতেও কোনরূপ ভীতিগ্রস্ত হলোনা। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে প্রশ্ন করে বললেন, তোমরা দুনিয়াকেও ভালবাসলে না, বেহেশ্তকেও চিনে নিলে না, দোজখ দেখেও তা থেকে পরিত্রাণের জন্য নিষ্কৃতি চাইলে না, তাহলে তোমরা কিসের বাসনা কর? তারা তখন উত্তরে বললেন, হে আমাদের প্রভু! আমরা কিসের বাসনা করি তা তো তুমি ভাল করেই জান, আমরা তো কেবল তোমাকে পাওয়ার বাসনাই করি, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টিই তো আমাদের মনের কামনা বাসনা। আমাদের তো আর অন্য কোনই কামনা বাসনা নেই। আমরা যে কেবল তোমাকেই চাই। সুতরাং আমাদেরকে দুনিয়া ও বেহেশ্তের সৌন্দর্য আর দোযখের আগুন দেখিয়ে লাভ কি?

এঁরাই হলো আদর্শ দোয়াকারীগণের আদর্শ দল, খোদার প্রিয়ভাজনদের দল, এঁদের কামনা কেবলই খোদার নৈকট্য লাভ। এতদব্যতীত আর কিছুই তাদের কামনা নয়। খোদার সন্তুষ্টিতেই তাঁদের সন্তুষ্টি, এর বাইরে তাঁদের আর কোন চাওয়া পাওয়া নেই। এমন সজ্জনদের জন্যই খোদা সংরক্ষিত রেখেছেন সেই বিশেষ চারটি পুরষ্কার অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক ও শহীদ, ছালেহ্, যার উল্লেখ আমি এর পূর্বেই করে এসেছি। এই সেই আদর্শই হতে হবে প্রতিটি দোয়াকারীর আদর্শ ও পাথেয়। এক্ষেত্রে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষা হলো, 'দুনিয়াতে যা কিছু সম্ভব কেবল দোয়া দ্বারাই সম্ভব।" তিনি (আঃ) আরো বলেছেন, 'হে আমার অনুসারীগণ! তোমরা বিপদ দেখলে আরো সামনে অগ্রসর হবে এবং তা থেকে পরিত্রাণের আশায় তোমরা তোমাদের স্বীয় দ্বার রুদ্ধ করে রহমান খোদার দরবারে সেজদায় পড়ে ক্রন্দনরত হয়ে পড়বে, জানবে ইহাই তোমাদের জন্য মুক্তির পথ। কারণ খোদার আদেশ ব্যতীত কখনও কারো উপর কোন বিপদ নিপতিত হয় না, পক্ষান্তরে তাঁর আদেশ ব্যতীত কখনও কারো উপর থেকে কোন বিপদ দূরীভূতও হয় না।" সুতরাং সেই সংকটকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় কেবল সর্বশক্তিমান খোদার দরবারে প্রার্থনা করাই হচ্ছে সর্বজনের সর্বপ্রধান কাজ। আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'যদি তোমরা দোয়া না কর তবে তাতে আমার কী-ই বা আসে যায়?" মূল কথা হচ্ছে দোয়াই হলো প্রতিটি মানুষের সকল সফলতার মূল চাবিকাঠি, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনলদাহ থেকে মুক্তি লাভ। নুহ (আঃ)-কে মহা প্লাবন থেকে পরিত্রাণ দান, মূসা (আঃ)-কে সাগর পাড়ি দিতে সহায়তা প্রদান আর আরবের নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে গুহায় আশ্রয় দিয়ে মাকড়সার জাল দ্বারা সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা ও জামানার ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে He is your enemy এলহাম দ্বারা সতর্ক প্রদান এর প্রত্যেকটা ঘটনাই উত্তম দোয়াকারীর অনন্য সফলতার অনন্য নজীর। সুতরাং যেসব বাঞ্ছিত কাজ সমাধানে মানুষ যেখানে তার সাধ্য সাধনায় ব্যর্থ, সেখানে কেবল দোয়াই তা সমাধানে সমর্থ। এটাই হলো দোয়ার শান ও মর্যাদা, আর এই সেই শানকে অবলম্বন করেই মানুষের উর্ধ্বারোহন সম্ভব, অন্যথায় নহে। এই দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন,

'খোদার সান্নিধ্য লাভের আশায় মানুষের মনে প্রথমে যে প্রেরণার সৃষ্টি হয়, তারই নাম হলো দোয়া, এটা একটি দাহিকা শক্তি সম্পন্ন অগ্নি বিশেষ যা হৃদয়ের বিষক্রিয়াকে দাহ করে দেয়। এটা এক ধরণের মৃত্যু কিন্তু অবশেষে তা সেই আত্মাকে জীবন দান করে থাকে। এ এক প্রকার প্লাবন বিশেষ কিন্তু পরবর্তীতে তা এক নৌকায় পরিণত হয়ে দোয়ায় অবনতকারী ব্যক্তিকে বহন করে চলে। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যিনি দোয়া করে ক্লান্ত হন না, কেননা তিনি একদিন মুক্তি পাবেনই। কারণ খোদার পক্ষ থেকে দোয়ার এই প্রেরণা আসে আর খোদার দিকেই তাকে নিয়ে যায়, ফলে খোদা ও দোয়াকারী এত কাছে এসে যান যেমনিভাবে একটি মানুষের প্রাণ মানুষের কাছে এসে থাকে। "মানুষের এই স্তরে পৌছার প্রেক্ষিতেই খোদাতাআলা এরশাদ করেছেন, তার হাত খোদার হাত, যা তাদের হাতের ওপর রয়েছে' (সূরা আল্ ফাতাহ) তিনি আল্লাহ্ আরো বলেন, তুমি যা নিক্ষেপ করেছিলে তা তুমি নও বরং খোদা তা নিক্ষেপ করেছিলেন," (সূরা আনফাল ঃ ১৮)।

পরিশেষে বলতে হয়, পরম সত্য এই যে, দোয়া হলো মানুষের আত্মার এক নিকটতম আত্মীয়, যা তাকে সদা সর্বদা সহায়তা দান করে। দোয়া মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে তাকে চিরঞ্জীব করে রাখে, মানুষের মন ও প্রাণকে সদা সজীব রাখে। মানুষকে ভ্রান্ত পথের অন্ধকার কুজ্জটিকা থেকে টেনে এনে জ্যোতির্ময় পথে পরিচালিত করে, যার ফলে মানুষ তখন অতি সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অন্যায় ও অশুভ কাজকে দেখতে পায় এবং তার দ্বারা সাধিত এই কাজকে সে সুবিশাল ঘৃণার কাজ বলে মনে করে। ফলে তাঁর আত্মা তখন নির্মল ও পবিত্রতা অর্জনের দিকে ধাবিত হয় এবং শান্তি ও কল্যাণ কামনায় উদগ্রীব হয়ে উঠে। মানুষের আত্মার এহেন পরিবর্তন সাধন হওয়ার পর মানুষ তখন যা অর্জন করে তা কখনও ভ্রান্ত কিংবা অকল্যাণকর কিছু হতে পারে না। এমন আরাধ্যকারীকে কিছু দেয়ার জন্যই খোদা তার রত্ন ভান্ডারকে আজীবনকাল উন্মুক্ত করে রেখেছেন। তাই এখানে আমি বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে আমার লেখাকে এতটুকুই শেষ করতে চাই যে, আমি আমার পিতা ও পিতামহ সহ এবং জামাতের অনেক সুধীজনই আপনাদেরকে যুগ ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর দাবী ও তাঁর সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়েছি এবং তাঁকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আপনাদের একীন জন্মায়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার শেষ আরজ এই যে, আপনারা দোয়া করুন এবং আরো দোয়া করুন যেন রহমান খোদা আপনাদেরকে এই সত্য চেনার কাজে অফুরান সহায়তা দান করুন। এখানে স্মরণ রাখবেন যে, দোয়ার ক্রন্দন দ্বারা কোন প্রাপ্তি কখনও ভুল কিংবা অকল্যাণকর কিছু এতে পারে না। অন্যথায় মনে রাখবেন, জগৎ জুড়ে আজ অস্থিরতার যে দাবদাহ শুরু হয়েছে তা কখনও উপশম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শেষ করেন।

মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফরের প্রতিবেদন

(৫ম কিস্তি)

১৩তম দিন (২৭ মার্চ রোজ শনিবার)

ভোরে মোকাররম উমর মাআয সাহেব তাহাজ্জুদের নামায পড়ান। এতে ১৩ হাজারেরও অধিক লোক অংশ নেন। সকল বন্ধু হুযূর (আইঃ)-এর ইমামতীতে ফজরের নামায আদায় করেন।

জলসা সালানার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে ১০টার সময় মোকাররম আব্দুর রশিদ সাহেব আনোয়ারের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। এতে ফ্রানসিসি ভাষায় বক্তৃতা হয় এবং সাথে সাথে মোরে ভাষায় অনুবাদ হয়।

৪-৩০মিঃ সময় হুযূর আনোয়ার (আইঃ) জলসা গাহে আগমন করেন এবং যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামায আদায়ের পরে জলসার সমাপ্তি অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয় কুরআন করীম তেলাওয়াতের মাধ্যমে। মোকাররম রানা ফারুক আহমদ সাহেব কুরআন তেলাওয়াত করেন। অনুবাদ করেন মোকাররম কাবূরে সুলায়মান সাহেব। এর পরে মোকাররম উমর মাআয সাহেব হৃদয়গ্রাহী সুরে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামের ওপরে ভিত্তি করে নযম পাঠ করেন। নযমে এ পংক্তি বার বার পাঠ করেন ইয়া মাসরূর ইন্নী মাআকা-ইন্নী মাআকা ইয়া মাসরূর"

এ সময় ১৩ হাজারেরও অধিক লোক নিজেদের ডান হাত উঠিয়ে এ পংক্তি একই ভাষায় পড়তে থাকেন। খুবই আত্মবিলীন ও ঈমান বর্ধক দৃশ্য ছিলো। এ নযমের পরে হুযূর আনোয়ার তাঁর সমাপ্তি ভাষণ দেন। এর সাথেই জামাতে আহমদীয়া বুরকিনা ফাঁসূর ১৫তম সালানা জলসায় সমাপ্তি ঘটে। হুযূর আনোয়ার তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

এ সব জলসার উদ্দেশ্য যেভাবে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক মানকে উন্নততর করা'। আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্তাআলা এ যুগে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে ইমাম বানিয়ে পাঠিয়েছেন যেন ইসলামকে আসল আকৃতিতে লোকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা যায়। আবার একে মুমিনদের জামাতে পরিণত করা যায়। তারা হবেন ইবাদুর রহমান বা রহমান খোদার দাস। আল্লাহ্র ইবাদতকারী ও তাঁর আদেশ-নিষেধের ওপরে আমলকারী। প্রত্যেক প্রকার শির্ক, তা প্রকাশ্যই হোক বা গোপন, এথেকে বিরত থাকবে, মিথ্যা থেকে বিরত থাকবে এবং খোদাতাআলার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।

এটা খোদাতাআলার অনুগ্রহ, এ যুগে আমাদেরকে সত্যিকারের প্রেমিকের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। অতএব এটা আমাদের ওপরে ন্যস্ত বিরাট দায়িত্ব যে, আমরা যেন আল্লাহ্তাআলার নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী হই। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে ৫ ওয়াক্ত নামায রীতিমত আদায় করার জন্যে আদেশ দিচ্ছেন। কেবল ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়কারীই যেন না হই বরং মসজিদে গিয়ে যেন নামায আদায় করে মসজিদকে আবাদ রাখি।

বা-জামাত নামাযে যেন আমরা উৎসাহ বোধ করি আর শিশুদেরকেও যেন নামাযী বানাই। এবং খোদাতাআলার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক সৃষ্টিকারী বানাই। নিজেদের স্ত্রীদেরকেও যেন নামাযী বানাই। তারা যেন আল্লাহ্র ইবাদতে শিথিলতা না দেখায়। কখনও কখনও লোক রীতি-নীতির শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এথেকে রক্ষা পাওয়া আবশ্যক। মিথ্যা এক প্রকার শির্ক, এথেকে বিরত থাকুন। এমন কথাবার্তা থেকেও বিরত থাকুন যা কওলে সাদীদ বা সহজ সরল কথা নয়। আর বিভিন্ন অর্থ হয় এমন ভুল-ত্রুটিপূর্ণ কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকুন।

হুযূর আনোয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মু'মিন তার রিয্ক থেকে খোদার পথে ব্যয় করে। এর অভ্যাস সৃষ্টি করুন। হুযূর নির্দেশ দেন, সব সময় স্মরণ রাখুন আমাদেরকে আল্লাহ্র পথে কিছু না কিছু ব্যয় করতেই হবে। এতে আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। জামাতে শামেল হওয়ার জন্যে আবশ্যক, পরিপূর্ণভাবে নেযামের আনুগত্য করা হয়। এজন্যে মু'মিনদেরকে এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন সব সময় আনুগত্যশীল হয়ে থাকে। কখনও এমন না হয় যে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলে আপত্তি করে বসে।

এ পর্যায়ে হুযূর আনোয়ার আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেন এবং ইতায়াত ও আনুগত্যের বিষয়কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। এভাবে এমন হাদীসেরও উল্লেখ করেন যাতে মুসলমানের নিজ ভাইকে ভালবাসার আদেশ রয়েছে। যেসব দেশে জামাত মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এরও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেন।

হুযূর বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, গরীবদের আশ্রয়স্থল হয়ে যাও। গরীবদের সাহায্যকারীতে পরিণত হও। আর ইসলামী সেবাকে বিস্তৃতি দান করার লক্ষ্যে সৌন্দর্যের পূজারীর ন্যায় বিলীন হতে প্রস্তুত হও এবং সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাও যেন সাধারণ কল্যাণ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে আর ঐশী ভালবাসাও খোদার বান্দাদের প্রতি সহানুভূতি সুদৃঢ় হয়।

আফ্রিকার দেশগুলোতে শিক্ষা বিস্তারের কথা বলতে গিয়ে হুযূর উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, শিশুদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। কেননা, আহমদী শিশুদের শিক্ষার মান অন্যান্যদের চেয়ে উন্নত হওয়া আবশ্যক।

কম্পিউটার প্রসঙ্গে বলেন, আজকাল কম্পিউটার শিক্ষা খুবই জরুরী। আফ্রিকায় জামাত কম্পিউটার সেন্টার চালু করেছে। সেখানে শ' শ' যুবক উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু কম্পিউটার কখনও কখনও অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হয়। আহমদীরা সব সময় এথেকে বিরত থাকে এবং আহমদীদের স্বাস্থ্য সর্বদা যেন পবিত্র থাকে।

হুযূর (আইঃ) স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে জামাতের সেবার উল্লেখও করেন এবং বলেন, জামাত বুরকিনা ফাঁসূতে খুব ভালভাবে সেবা দান করে যাচ্ছে।

মহিলাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন, মহিলারা স্মরণ রাখুন, ইসলাম তাদেরকে একটি বিরাট মর্যাদা দান করেছে। তারা যদি এ মর্যাদাকে না বুঝে তাহলে তাদের সন্তান-সন্ততির ধর্মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার কোন নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে না। এজন্যে নিজেদের মর্যাদাকে উপলব্ধি করুন নচেৎ আপনি আপনার সন্তান-সন্ততির ও স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ততা করছেন। বরং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, খোদার সাথেই অবিশ্বস্তার কাজ করে থাকবেন। এজন্যে প্রত্যেক আহমদী মহিলার

জন্যে অবশ্য কর্তব্য; নিজের প্রভু-প্রতিপালককে খুশী করুন এবং নিজের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঝুঁকেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চান। শিশুদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা প্রবেশ করানোর জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যেন তারা নিজেরা জ্ঞান লাভ করে। আজকাল পরিবেশ অনেক মন্দ প্রভাবে প্রভাবান্বিত। একজন আহমদী মহিলার নিজের প্রজন্মকে রক্ষা করা আবশ্যক। স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে সবসময় সুরক্ষা পাওয়া উচিত।

পরিশেষে হুযূর (আইঃ) সব আহমদীকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, যখন আহমদী পুণ্যবান হয়, তখন দোয়া করে আর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। তাই নিজের ও দেশের জন্যে দোয়া করুন।

দোয়ার পরে হুযূর (আইঃ) লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জলসাগাহে গমন করেন এবং সেখানে কিছু সময় কাটান। এ পর্যায়ে বালক-বালিকারা স্থানীয় ভাষায় আনন্দের সাথে নযম পাঠ করে আর মহিলারা আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা ও তকবীর ধ্বনি উচ্চরিত করে অতি আনন্দের সাথে হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানান।

এরপর হুযূর অফিসে গমন করেন এবং বিশেষ বিশেষ মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এ জলসার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আর্চ বিশপ, ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী, ন্যাশনাল আর্মীর প্রতিনিধি, মুসলিম কমিউনিটি, তিজানা ও মোরী কমিউনিটি প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন উচ্চস্তরের জীবন যাপনকারী লোকদের প্রতিনিধিবৃন্দও অংশ গ্রহণ করেন। জলসা সালানায় দেশের ৪২৫টি জামাতের ১৩,৭৫৫ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতিরেকে নাইজেরিয়া, টোগো, মালী, আইভরিকোষ্ট ও ঘানা থেকেও বন্ধুরা অংশ গ্রহণ করেন।

এ জলসার কার্যক্রম এখানকার ন্যাশনাল টি.ভি. রেডিও এবং পত্র-পত্রিকা খুবই উন্নত পর্যায়ে বিস্তারিত কভারেজ দেয় এবং জলসা সালানার দৃশ্য দেখায়। হুযূর আনোয়ারকে বক্তৃতা দিতে দেখানো হয়।

১৪তম দিন (২৮ মার্চ রোজ রবিবার)

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) মসজিদুল মাহ্‌দীতে ফজরের নামায পড়ান। ১০ টার সময় বুরকিনা ফাঁসুর ১২টি রিজিওন থেকে আগত জামাতের রিজিওনাল সদর সাহেবান, সেক্রেটারী সাহেবান, অঙ্গ সংগঠনের সদর সাহেবান, যয়ীমগণ ও অন্যান্য কর্মকর্তা, যাদের সংখ্যা ৫০০ থেকে বেশি হুযূর আনোয়ারের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

সর্ব কর্মকর্তা পদাধিকারের বিন্যাসের দিক থেকে রিজিওনওয়ারী সারিবদ্ধ হয়ে বসেন আর তাদের সারির সম্মুখে রিজিওনের নামাঙ্কিত সাইন বোর্ড ঝুলানো ছিলো। এ ছাড়াও আইভরিকোষ্ট ও মালী থেকে আগত প্রতিনিধিদলও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হুযূর আনোয়ার এ উপলক্ষ্যে বলেন, জলসা সালানার সময় আমার ও অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্য আপনাদের শুনার সৌভাগ্য হয়েছে। এবং আপনারা Recharge হয়েছেন। আপনারা ফিরে গিয়ে সব জমাতে নেযামে জামাতকে সুদৃঢ় করুন। আপনাদের কাছে মুরব্বীরা রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে পথ নির্দেশনা নিন। মজলিসে আমেলার সব বিভাগকে কর্মতৎপর হওয়া আবশ্যক। জামাতের সদর ও সেক্রেটারী মালকে কর্মতৎপর হলেই চলবে না। প্রত্যেক বিভাগকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। জাগরণের সাথে কাজ করতে হবে।

হুযূর আনোয়ার সদ্য সমাপ্ত জলসায় কতটা প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে তা অবহিত হওয়ার জন্যে সবার আগে বানফুরের লোকদের কাজে জানতে চান। এর জবাবে বানফুর রিজিওনের সদর সাহেব বলেন, আমাদের জলসা সালানা তো এ দিন থেকেই আরম্ভ হয়েছিলো যখন আমরা এ সংবাদ পাই যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস বুরকিনা ফাঁসূতে আগমন করতে যাচ্ছেন। এর আগে আমরা এমটিএ'র ও ছবির মাধ্যমে আপনাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি কিন্তু আপনাকে সামনাসামনি দেখা আমাদের কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে আর আবেগাপ্লুত হওয়ার কারণে এর বেশি বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তানগৃডু গোর রিজিওনের প্রতিনিধি বলেন, আমরা অশেষ আনন্দিত হয়েছি। হুযূর (আইঃ) জলসায় যোগদান করেছেন এতে আমাদের খুশীর শেষ নেই। আমরা খুশী প্রকাশ করার শক্তি পাচ্ছি না।

হুযূর (আইঃ) বলেন, জাযাকুমুল্লাহ্।

Gava রিজিওনের একজন প্রতিনিধিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ অধম রেডিও ইসলামিক আহমদীয়ার মাধ্যমে আহমদীয়ত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এর আগে ৪টি জলসা ও ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কিন্তু এবার যে হুযূরকে দেখেছি এবং কথা শুনেছি এখন অবস্থা অন্য রকম। আমি ফিরে গিয়ে হুযূর আনোয়ারের বিষয় ও আপনার বক্তৃতার বিষয় সকলকে বলবো।

তিনি আরো বলেন, আপনার বক্তৃতায় জামাতের সেবা করার কথা শুনলাম। কুয়ো নির্মানের ব্যাপারে আপনার সেবার প্রশংসার যোগ্য। আমাদের এলাকাতে এর প্রয়োজন রয়েছে।

হুযূর আনোয়ার বলেন, আপনারা লোকদের জন্যে আধ্যাত্মিক পানির বন্দোবস্ত করুন বাহ্যিক পানিও পেয়ে যাবেন। আবার বলেন, তাদেরকে কুয়ো নির্মাণের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করুন।

আইভরিকোষ্টের ন্যাশনাল সদর, খোদ্দামুল আহমদীয়া বলেন, "এ জলসা অপরিসীম সফলতা লাভ করেছে। কেবল কয়েক বছর পূর্বে এখানকার জামাত খুবই ক্ষুদ্র ছিল আর এ জামাত অতুলনীয় উন্নতি লাভ করেছে।' আমরা আইভরি কোষ্ট থেকে খুব কষ্টদায়ক ও চরম ক্লান্তিজনক সফর করে এখানে এসেছি কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর চেহারার ওপরে দৃষ্টি পড়তেই অনুভব করলাম যে, ক্লান্তির কোন নাম গন্ধও নেই।

পরিশেষে তিনি আইভরি কোষ্টের দিন দিন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা বলতে গিয়ে দোয়ার আবেদন করেন। আর অঙ্গীকার করেন যে, ফিরে গিয়ে পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে কাজ করবেন যেন অবস্থা উন্নতি হয় এবং খলীফাতুল মসীহ্ আইভরি কোষ্টে সফরে আসতে পারেন। আরও বলেন, আমাদের গোটা প্রতিনিধিবৃন্দ জলসা সালানার সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হওয়ার জন্যে মোবারকবাদ জানাচ্ছে।

হুযূর (আইঃ) বলেন,

আইভরিকোষ্টে আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে বড় বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সবের সাথে সংযোগ রক্ষা করুন। অবস্থার কারণে গণসংযোগ যে বিচ্ছিন্ন হয়েছে একে ঠিকঠাক

করুন। আর সব লোককে জামাতের নেযামের অন্তর্ভুক্ত করুন। এবং সব জামাতে বার বার সফর করুন। তিনি বলেন, আপনাদের দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হোক যেন আমি সেখানে সফর করতে পারি। দিরগো রিজিওনের প্রতিনিধি তাঁর আবেগ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

সর্বপ্রথম তো আমরা সকলকে প্রীতিপূর্ণ আস্‌সালামু আলায়কুম বলছি। জলসার আনন্দ এখনও প্রাণে ভরতি রয়েছে। আমরা প্রথমবার যুগ-খলীফার সাথে জলসায় একত্র হয়েছি। আর হুযূর আনোয়ারের সাথে ৩ দিন আধ্যাত্মিক পরিবেশে অবস্থান করেছি। এ রকম আর কোন দিন হয়নি। এখন আমরা ফিরে গিয়ে আপনার উপদেশ ও আপনার বাণী নিজেদের জামাতে পৌছে দেবো। আপনাকে দেখেই এমন মনে হলো, আপনি আল্লাহ্‌র মানুষ। আজ বুরকিনা ফাঁসূর মাটি কত সৌভাগ্যশালী যে, এখানে আপনার পদচারণা ঘটেছে। আহমদীয়তের সাথে বন্ধন আগের চেয়ে আরও অধিক বেড়ে গেছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয় সাল্লাম ভবিষ্যত কালে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর এ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সবসময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আজ আমরা আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি। আমরা ইনশাআল্লাহ্‌ খিলাফতে আহদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকবো। ভবিষ্যতে আগমনকারী খিলাফত সম্বন্ধে তার (সঃ) ভবিষদ্বাণী আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা ইনশাআল্লাহ্‌ আপনার সাথে থাকবো। আমরা প্রতিটি মুহূর্ত আপনার সাথে রয়েছি। ইন্নী মাআকা ইয়া মাসরূর। আমরা খোদার কাছে দোয়া করি, আপনি বারবার এখানে পদধূলি দিন। আমরা আহমদীয়তের উন্নতির জন্যে দোয়া করছি। আপনি আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে দোয়া করবেন। আমরা দূর্বল। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের ওপরে নিজ অনুগ্রহ অবতীর্ণ করুন।

Oyhgoya রিজিওনের প্রতিনিধি বলেন ঃ

আজ আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা প্রাথমিক কালের সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা প্রথম আহমদীয়ত গ্রহণ করেছে। আপনাকে দেখে, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে আমরা যারপরনাই খুশী হয়েছি। পাকিস্তান থেকে আগত মুবাল্লেগীন খুব ভাল কাজ করছে। এমন মোবাল্লেগ সব স্থানে থাকা আবশ্যক। এতে হুযূর বলেন, প্রত্যেক স্থানে পাকিস্তানী মোবাল্লেগ যেতে পারেন না। আপনারা স্বয়ং মোবাল্লেগে পরিণত হোন।

এ প্রতিনিধি নিজের কথা অব্যাহত রেখে বলেন, আমরা খোদার শোকরিয়া আদায় করছি, এখানে বুরকিনা ফাঁসূতে আহমদীয়ত বৃক্ষে ফল দিয়েছে। এখন এ ফল পেকেছে আর আজ আমরা এখন খাচ্ছি। হুযূর (আইঃ) এর নিকট দোয়ার আবেদন আল্লাহ্‌তাআলা যেন আমাদেরকে আরও ফল লাভ করার সৌভাগ্য দান করেন।

এর প্রেক্ষিতে ওপরে হুযূর (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদেরকে আরও গাছ লাগাতে ও আরও ফল লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন।

এরপর হুযূর আনোয়ার পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক রিজিওন এবং আইভরিকোষ্ট ও মালীর প্রতিনিধির সাথে মোসাফাহ্‌ করেন।

মোসাফাহ্‌র পরে কোন কোন লোক বিশেষ করে অনেক বেশি বয়সের লোক বলেন, আমরা অনেক কষ্ট করে এবং দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি আর আমরা সারাটা পথে এ দোয়া করেছি যে, আল্লাহ্‌ যেন এমন সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যাতে আমরা খলীফার হাতের স্পর্শ লাভ করতে পারি। পরে জানিনা আবার সাক্ষাতের সুযোগ হয় কি না হয়। আজ আল্লাহ্‌ আমাদের দোয়া শুনেছেন। আর আমাদের হাত হুযূরের হাতকে ছুঁয়ে নিয়েছে।

হুযূর আনোয়ারের সাথে মোসাফাহ্‌ করার পরে লোকেরা নিজেদের হাত নিজেদের সারা মুখে ও কাপড়ে মলতে থাকে। প্রত্যেক লোকের ভালবাসার ধরণ আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। এক সাহেব মোসাফাহ্‌ করার পরে নিজের হাত রুমাল দিয়ে লেপ্টে নেয় আর বলে, যেন আমার হাত অন্য কারও হাতে না লাগে আর আমি এ বরকতকে সাথে নিয়ে যাব।

একদিন হুযূর আনোয়ার যাওয়ার সময় একটি শিশুকে আদর করেন এবং তার সাথে মোসাফাহা করেন তখন নিকটে দাঁড়ানো লোকেরা সেই শিশুটির হাতে চুমু খেতে থাকে কেননা এ হাত হুযূরের হাত স্পর্শ করেছে।

বুরকিনা ফাঁসূর জলসা সালানায় Mali-এর ১৯টি জামাতের ১২০ জন বন্ধু শামেল হয়েছিলেন। এদের মাঝে জামাতের সদর সাহেবান, সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া ও অন্যান্য বন্ধু, মহিলা ও শিশুরা ছিল।

Ivory Coast-এর ১৫২ জনের একটি প্রতিনিধি দল জলসায় যোগদান করতে এসেছিলেন। এতে মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ, সদর- মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, সদর- মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং বিভিন্ন রিজিওনের ২১টি জামাতের বন্ধুগণ শামেল ছিলেন।

এসব বন্ধুর সাথে মোসাফাহ করার পরে হুযূর অফিসে চলে যান। চিঠি-পত্র দেখেন। এরপরে ১১-৩০ মিঃ-এর সময় পারিবারিক সাক্ষাৎকার আরম্ভ হয়। ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত এটা চলে। বিকাল ৫-৩০ মিঃ-এর সময় হুযূর মিশন হাউসে গমন করেন। এবং Children class-এ যোগদান করেন। হুযূর আনোয়ার একটি শিশুকে কুরআন তেলাওয়াতের জন্যে ডাকেন এবং নযম পাঠের জন্যে একটি শিশুকে নির্বাচিত করেন। এরপর হুযূর নাসেরাত ওহ্‌ পেশওয়া হামারা জিম সে হ্যা নূর সারা- নযমটির ফ্রানসিসি অনুবাদ মনোরম সুরে পাঠ করে শুনায়। এরপর সমবেত কোরাস শুনেন। একটি শিশু ফ্রেন্স ভাষায় সম্বর্ধনা বক্তব্য রাখে আর হুযূর আনোয়ারকে খোশ আমদেদ বলতে বলতে বুরকিনা ফাঁসূর পরিচিতি উপস্থাপন করেন।

নাসেরাত একটি মনোমুগ্ধকর সুরে আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা গীত পেশ করে। আর DJOOLA -ভাষায়ও একটি গীত উপস্থাপন করা হয়।

আইভরিকোষ্ট থেকে আগত শিশুরাও একটি ফ্রেন্স নযম উপস্থাপন করে এর শেষ হয় আল্লাহু-এর মাধ্যমে। হুযূর আনোয়ার এ গীতকে এত পসন্দ করেন যে সাথে সাথে তিনিও আবৃত্তি করতে থাকেন। শেষে হুযূর সব শিশুর মাঝে চকোলেট বিতরণ করেন।

রাত ৮-৩০ মিঃ সময় বুরকিনা ফাঁসূ জামাত হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর সামনে Mess Dis Officers-এ একটি বৈশ ভোজের আয়োজন করেন। এতে জামাতের কর্মকর্তা ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ৯-৩০ মিঃ এ অনুষ্ঠান শেষ হয়। এরপর হুযূর (আইঃ) নিজ আবাসস্থলে গমন করেন। (চলবে)

অনুবাদ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জামাতের নির্দেশনা

মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন বিষয়ে আহমদীদের অবস্থান বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঈদে মিলাদুন্নবী প্রসঙ্গে একটি নীতিগত প্রশ্ন মুফতী সিলসিলাহ্‌র কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। এর উত্তরে মুফতী সিলসিলাহ্ আহমদীয়া মোকাররম মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব তাঁর ২৬.০৬.২০০৩ তারিখের একটি পত্রে যুগ খলীফাদের বর্ণনার আলোকে যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন তা হচ্ছে ঃ

১২ই রবিউল আউয়াল বিশেষভাবে জলসা করা ঠিক নয়। কেননা একবার 'পয়সা আখবার' পত্রিকায় ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে তাহ্‌রীক করে যে, এই দিনে সকল মুসলমানের ভালোভাবে গোসল করে পবিত্র হয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা উচিত। এ বিষয়ে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি বলেন, ইসলামে কেবল দু'টি ঈদই রয়েছে। যা শরীয়তবাহক (সঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত, এছাড়া জুমুআর দিন আছে। (বদর ১৬ই মার্চ ১৯১১ সন, হায়াতে নূর পৃঃ ৫০৭)

একবার শিমলা জামাত আবেদন করেছিল যে, ঈদে মিলাদুন্নবী প্রসঙ্গে হুযূরের নির্দেশনা কি? এর উত্তরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলেন ঃ

'ঈদে মিলাদুন্নবী' বে'দাত। ঈদ তো কেবল দু'টি। এভাবে তো লোকেরা নিত্য নতুন ঈদের প্রবর্তন করতে থাকবে। আর আহমদীরা বলবে যে, মির্যা সাহেবের প্রথম ইলহাম প্রাপ্তির দিনও ঈদের দিন আর মৃত্যুর দিনও ঈদের দিন। আঁ-হযরত (সঃ)-এর সাহাবীরা তাঁর সবচেয়ে বড় প্রেমিক ছিলেন। তারাতো কোন তৃতীয় ঈদ পালন করেননি বরং তাদেরতো এটাই রীতি ছিলো যে, যতই তাকওয়া, নিষ্ঠা ও সততা থাকুক না কেন তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণই ধর্মের মূল ভিত্তি বলে মান্য করতেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী যদি জায়েয হতো তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সবচেয়ে বড় প্রেমিক হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতেন। এমন ঈদের প্রবর্তন করা মূর্খতা (জাহেলিয়ত)। আর এর প্রবর্তনকারীরা কেবল সাধারণ লোকজনকে খুশী করতে চায় নতুবা এর মাঝে কোন ধর্মীয় উদ্দীপনা নেই (বদর, ১৬ই মার্চ, হায়াতে নূরুদ্দীন পৃঃ ৫০৮)।

সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) বলেন, এ বিষয়ে আমাদের প্রয়াত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) জন্ম দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা দৃষ্টিপটে রাখা কর্তব্য। হুযূর (রাহেঃ) বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন যে, আঁ হযরত (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) এবং সাহাবী (রাঃ) কখনই জন্মদিন (Birth day) পালন করেননি। এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃকও এর সমর্থন পাওয়া যায় না। এজন্য ঈদে মিলাদুন্নবী উযযাপন কেবল একটি রুসূম এবং পরবর্তীকালে সৃষ্ট বে'দাত। এজন্য একে অনুৎসাহিত করা আবশ্যক। তবে সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা করা এবং সেদিন আনন্দ-ফূর্তি করা বৈধ। কিন্তু কোনক্রমেই এ জলসা ১২ই রবিউল আউয়াল করা বৈধ নয়। এছাড়া বছরের যেকোন দিন যখন ইচ্ছা এ জলসা করা যেতে পারে (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৪.০৫.২০০৩ তারিখের পত্র)।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

স্বাক্ষরিত-

মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন

মুফতি সিলসিলাহ্ আহমদীয়া

সার্কুলার নং- ০২৮/৩৪৭০ (১৫০)

মোহতরম আমীর / প্রেসিডেন্ট / মুরব্বী / মোয়াল্লেম সাহেবান

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালানোর অনুরোধ করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সাথী হোন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর রংপুর জেলার ২য় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর রংপুর জেলা আয়োজিত ২য় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা গত ১২ই জুন হতে ১৮ই জুন পর্যন্ত মাহিগঞ্জ মজলিসে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। ৪ দিনব্যাপী ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সদর সাহেব এর প্রতিনিধি জনাব মনোয়ার হোসেন। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব, কেন্দ্রীয় মোহতামীম আব্দুল মোমেন ও জেলা কায়েদ বৃহত্তর রংপুর প্রমুখ। এতে ৭টি মজলিস এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক্লাস শেষে গত ১৭ই জুন ও ১৮ই জুন দু'দিন ব্যাপী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমার ১ম দিন উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মেহেদী হাসান জেলা কায়েদ বৃহত্তর রংপুর। উদ্বোধনী শেষে ২য় দিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কমিটি ও মোয়াল্লেম সাহেবগণের মধ্যে হাড়িভাঙ্গা প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই জুন বেলা ২.৩০ মিনিটে। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব সাবের আহমদ, সদর সাহেবের প্রতিনিধি। বক্তব্য রাখেন জনাব আমীর হোসেন মোয়াল্লেম, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি প্রমুখ। আহাদ পাঠ করেন জেলা কায়েদ, জনাব মেহেদী হাসান। এরপর সভাপতি সাহেব তার মূল্যবান ও নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন।

সবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে যেসব অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মোঃ গোলাম রাব্বি
জেলা মোতামাদ
বৃহত্তর রংপুর

চট্টগ্রাম জেলা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ৭ দিনব্যাপী তা'লীম-তরবিয়তি ক্লাস ও ইজতেমা সুসম্পন্ন

গত ১২ জুন থেকে ১৮ জুন ৭ দিনব্যাপী চট্টগ্রাম জেলা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস ও ইজতেমা চকবাজারস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ কমপ্লেক্সে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও চাঁদপুর জেলা মজলিস থেকে ৭০ জন খোদ্দাম ও আতফাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশগ্রহণ করেন।

তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস ও ইজতেমা সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়। চরম মুখালেফাতের ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করেও চট্টগ্রাম, ফাজিলপুর, অম্বরনগর ও নুসরাতাবাদ মজলিস থেকে ৪১ জন খোদ্দাম ও ২৯ জন আতাফাল টি.টি. ক্লাস ও ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে। গোটা চট্টগ্রামে স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ক্লাস ও ইজতেমার সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। বিশেষ করে ১২ জুন ও ১৮ জুন দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক পূর্বকোণে অনুষ্ঠানের সংবাদ পরিবেশিত হয়।

তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস পর্বে শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা, নযম শিক্ষা, বক্তৃতা শিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞানমূলক শিক্ষা, অর্থসহ নামায শিক্ষা, সিলসিলার কিতাব শিক্ষা, উর্দু শিক্ষা তবলীগী বিষয়সমূহ শিক্ষা এবং তরবিয়তি বক্তৃতাসমূহ উল্লেখযোগ্য ছিল। ক্লাসগুলো পরিচালনা করেন সর্বজনাব মোয়াল্লেম মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, মোয়াল্লেম জাহিদুল ইসলাম, দেহাতি মোয়াল্লেম আনোয়ার আহমদ, আলমগীর আহমদ, মোয়াল্লেম এস. এম. মাহমুদুল হক প্রমুখগণ। এছাড়া নিয়মিতভাবে উপস্থিত খোদ্দাম-আতফালদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর এবং তবলীগী মসলা মাসায়েল ক্লাস পরিচালনা করেন মুরব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। বিষয়ভিত্তিক তরবিয়তি বক্তৃতা পর্বে স্থানীয় আমীর এস, এ, নিজামী, জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্জ নাজির আহমদ, আরিফ-উজ-জামান, প্রাবন্ধিক ও কলামিষ্ট ও সেক্রেটারী তবলীগ নেছার আহমদ ও মাহমুদ হাসান ফুলু, ধারাক্রমে বক্তৃতা করেন। তরবিয়তি সভায় চট্টগ্রাম, ফেনী, চাঁদপুর ও নোয়াখালী জেলা মজলিসের জেলা কায়েদ মনসুর আহমদ সভাপতিত্ব করেন। প্রত্যেকটি তরবিয়তি সভা কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।

গত ১৬ জুন বাদ মাগরিব ৩য় জেলা ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে রিজিওনাল কায়েদ এস. এম. ইব্রাহীম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইজতেমার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৭ ও ১৮ জুন ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৮ জুন ইজতেমার সমাপনী অধিবেশন বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব মাহবুবুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে স্থানীয় আমীর এস. এ. নিজামী, বিশেষ অতিথি হিসাবে মুরব্বী সিলসিলাহ্ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণ সঞ্চারী এবং উদ্দীপনাময় বক্তব্য প্রদান করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সদর মাহবুবুর রহমান সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর অমূল্য বাণী-ধারা ও রচনাবলীর আলোকে এক জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে জেলা কায়েদ মনসুর আহমদ তার সমাপনী ভাষণে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে সদর মাহবুবুর রহমান সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন।

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া
জেলা নায়েম ইশায়াত
চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী ও চাঁদপুর জেলা

চারদিনব্যাপী তৃতীয় চট্টগ্রাম বিভাগীয় ওয়াকফে নও শিশু ও পিতামাতা তালীম-তরবিয়তি ক্লাস ২০০৪ সুসম্পন্ন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে তৃতীয় চট্টগ্রাম বিভাগীয় ওয়াকফে নও শিশু ও পিতামাতা তালীম-তরবিয়তি ক্লাস ২০০৩-২০০৪ অত্যন্ত ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য, আনন্দঘন ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চারদিনব্যাপী তৃতীয় ওয়াকফে নও শিশু ও পিতামাতা তালীম-তরবিয়তি ক্লাস ২৬ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশন বাদ মাগরিব মাষ্টার নাভিদুর রহমানের সুললিত কুরআন তেলাওয়াত ও বুশরা মজিদের ইসলামী প্রাণোদ্দীপক নযম পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়। সভায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় আমীর এস. এ. নিজামী, অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ওয়াকফে নও ও পিতামাতা তালিম তরবিয়তি ক্লাস পরিচালক মনসুর আহমদ। মুরব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ওয়াকফে নও তরিবয়তি ক্লাসের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তালীম-তরবিয়তি (শিক্ষা ও চরিত্র গঠন) ক্লাসগুলো পরিচালনা করেন মোয়াল্লেম আনোয়ার আহমদ, মনিরুজ্জামান ভুঁইয়া, জাহেদুল ইসলাম ও নও আহমদী মওলানা মুহাম্মদ আলমগীর প্রমুখ।

গত ২৭, ২৮ ও ২৯ জুন অনুষ্ঠিত তালীম-তরবিয়তি ক্লাস নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়। ওয়াকফে নও শিশুদের ক্লাস পরিচালনার সুবিধার্থে A ও B এবং C ও D গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। প্রাত্যহিক ক্লাসসমূহে ১। সহী কুরআন তেলাওয়াত ২। দীনি মালুমাত (ধর্মীয় শিক্ষা) ৩। নযম শিক্ষা ৪। আদব-কায়দা বিয়ষক ক্লাস এবং খেলাধূলা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ওয়াকফে নও মাতাদের ক্লাস বিশেষ ব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়। আর এই ক্লাস মুরব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী পরিচালনা করেন। এছাড়া ওয়াকফে নও পিতাদের কুরআন শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করেন আনোয়ার আহমদ। ওয়াকফে নও অভিভাবকদের সম্মিলিত ক্লাস পরিচালনা করেন মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

গত ২৯ জুন বাদ মাগরিব সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুশিউর রহমান ওয়াকফে নও জাতীয় সচিব। সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমীর এস. এ. নিজামী, মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ও আলহাজ্জ নাজির আহমদ বক্তৃতা করেন। শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ভাষণ দেন চট্টগ্রাম ওয়াকফে নও সেক্রেকারী মনসুর আহমদ। সমাপনী অনুষ্ঠানে মিনহাজুর রহমান কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং শাফী নযম পরিবেশন করেন। পরে সভাপতি তালীম-তরবিয়তি ক্লাসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সম্মেলনের সংবাদ জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ৩ জুলাই (৭ পৃষ্ঠা) শনিবার সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

আমীর মাহ্মুদ ভুঁইয়া

ওয়াকফে নও সম্মেলন' ০৪

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্তাআলার অশেষ কৃপায় গত ১৪ই জুন '০৪ থেকে ১৮ই জুন '০৪ পাঁচ দিনব্যাপী ৬ষ্ঠ বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালীম-তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন ২০০৪ (১ম পর্ব) সাফল্যজনকভাবে মসজিদ বায়তুস সালাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন জনাব এস. এম. আবু কওসার (আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন)। এছাড়া আরও ছিলেন সহকারী বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান। ক্যারিয়ার এন্ড প্লানিং কমিটির সদস্য জনাব এস. এম. রেজাউল করিম, জনাব আহমদ আলী মোল্লা ও জনাবা ফাতেমা আহমদ। তালীম-তরবিয়তি ক্লাসে প্রস্তাবিত শিক্ষক হিসাবে মোয়াল্লেম জনাব শেখ আব্দুল ওয়াদুদ ও মোয়াল্লেম জনাব মনির হোসেন খান ছিলেন। সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় ছিলেন সুন্দরবন জামাতের খাদেম জনাব এম. শহীদুল ইসলাম।

তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ১৪ই জুন, ২০০৪ অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে ১৮ই জুন, ২০০৪ বা'দ জুমুআ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

তালীম-তরবিয়তি ক্লাস শেষে ওয়াকফে নও শিশুদের গ্রুপে বিভক্ত করে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। কিছু কিছু বিষয়ে পিতা-মাতাদেরও পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ওয়াকফে নও শিশু ২২ জন, পিতা-১৬ জন ও মাতা-১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান, ওয়াক্ফে নও সম্মেলন কমিটি

খুলনা বিভাগীয় ৬ষ্ঠ বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বের প্রতিবেদন

গত ২১শে জুন, ২০০৪ হতে ২৫শে জুন, ২০০৪ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে জুন, ২০০৪ তারিখ ৯-০০ ঘটিকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহকারী বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান। অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন সদর মুরব্বী মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন ও আহমদীয়া মুসলিম

জামাত, খুলনার আমীর-এর প্রতিনিধি ও ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। ৫ দিনব্যাপী এই সম্মেলনের সকাল ৯টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক তালীম-তরবিয়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তালীম-তরবিয়তি ক্লাসের শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা দান করেন সদর মুরব্বী মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং সর্বজনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোয়াল্লেম খুলনা জামাত, শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম- সুন্দরবন জামাত এবং মোহাম্মদ আবুল বাসার, মোয়াল্লেম- উথলী জামাত। প্রতিদিন বাদ মাগরিব পর্যায়ক্রমে ওয়াকফে নওদের তালীম-তরবিয়তি বিষয়সহ বিভিন্ন তরবিয়তি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, সদর মুরব্বী, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও খুলনা ও শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম। সম্মেলনে উপস্থিত ওয়াকফে নও ও পিতামাতাদের মধ্যে তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দীনি মালুমাত, বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-এর প্রতিনিধি ও খুলনা জামাতের আমীর জনাব শামসুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন সদর মুরব্বী মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন জনাব এস, এম আবু কাওসার, সহকারী বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব শেখ মাজফুজুর রহমান ও মোয়াল্লেম জনাব শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী ওয়াকফে নও সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুকরিয়া জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব ও সেক্রেটারী ওয়াকফে নও খুলনা জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। এই ওয়াকফে নও সম্মেলনে খুলনা জামাত ও উথলী জামাতের ওয়াকফে নও সন্তান, ওয়াকফে নও মাতা ও ওয়াকফে নও পিতা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ওয়াকফে নও সম্মেলন কমিটির সদস্য সচিব ও সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, খুলনা জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক।

মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য সচিব
বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন কমিটি

শুভ বিবাহ

❐ মরহুম আনোয়ার আলী প্রধান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সেলিনা বেগম, সাং- ৮৬, নবাব সলিমুল্লাহ্ রোড, মিশন পাড়া, নারায়ণগঞ্জ-এর বিয়ে মরহুম মোবারক করিম-এর পুত্র জনাব তাহের আহমদ শাহীন, সাং-অশ্বদিয়া, ডাকঘর- হাজীপুর, জেলা-কুমিল্লা-এর সাথে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৭/১২/০৩ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জস্থ কামালপাশা সাহেবের গৃহাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪১৮/০৪ তারিখ ১৩/০২/০৪।

❐ মরহুম মধু মিয়া-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মিনা খানম, সাং- উত্তর বাহেরচর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-এর বিয়ে জনাব সেকেন্দার দেওয়ান-এর পুত্র জনাব আমীর হোসেন দেওয়ান, সাং-চরদুখিয়া, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর-এর সাথে ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২০/০২/০৪ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাহেরচরস্থ কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব ডাঃ গোলাম মোরশেদ, প্রেসিডেন্ট বাহেরচর, ঢাকা। ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪১৯/০৪ তারিখ ২১/০২/০৪।

❐ মরহুম আইউব আলী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আকলিমা খাতুন, সাং- রঘুনাথপুর বাগ, যাদবপুর, জেলা-যশোর-এর বিয়ে জনাব হেলাল আহমদ ঢালী-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ঢালী, সাং-যতীন্দ্র নগর, শ্যামনগর,জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে ২০,০০১/= (বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৩/০২/০৪ তারিখ, রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুরবাগস্থ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪২০/০৪ তারিখ ২৯/০২/০৪।

❐ ডাঃ তমিজ উদ্দিন-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রহিমা বেগম পুষ্প, সাং- ৭৯, উলন, রামপুরা, ঢাকা-এর বিয়ে জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইউম বাবর, সাং-৪৩০-১, দক্ষিণ পাইক পাড়া, মিরপুর-১, ঢাকাস্থ-১২১৬-এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৭/০২/০৪ তারিখ, রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্। ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪২১/০৪ তারিখ ২৯/০২/০৪।

❐ জনাব হুমায়ুন আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফারজানা আক্তার (আঁখি), সাং-কান্দিপাড়া, উত্তর আহমদীপাড়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিয়ে জনাব আব্দুল খালেক চৌধুরী-এর পুত্র জনাব তৌশিক আহমেদ, সাং-চন্ডিছড়া চা বাগান, হবিগঞ্জ-এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৭/০২/০৪ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মৌলবী এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪২২/০৪ তারিখ ০৫/০৩/০৪।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

The AHMADI Bulletin 15 July, 2004
(Published for Talim and Tarbiyyat for the members of Ahmadiyya Muslim Jamaat)

তরবিয়ত ও তাহরীকে জাদীদ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য

অতএব তুমি তোমার সকল মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর... সুতরাং তোমরা সকলে তাঁর দিকে ঝুঁকে অগ্রসর হও এবং তাঁর তাকওয়া (খোদাভীতি) অবলম্বন কর এবং নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (সূরা আর রূম ৩১-৩২ আয়াত)।

১। **তরবিয়ত ঃ** কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশ এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী সকল স্থানীয় জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট, মুরব্বী সিলসিলাহ্, মোয়াল্লেম এবং সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, জামাতের সকল মসজিদকে পাঁচ ওয়াক্ত বা-জামাত নামাযের মাধ্যমে আবাদ রাখা, হালকা মিটিংগুলি নিয়মিত জারি রাখা, যেখানে হালকা নেই সেখানে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তরবিয়তী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা, সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নী যেন প্রত্যহ কুরআন তেলাওয়াত করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও জামাতের বই কিছু না কিছু যেন নিয়মিত পাঠ করেন সেজন্য সবিশেষ অনুরোধ করছি।

এম.টি.এ ঃ বর্তমানে আকাশ-সংস্কৃতি ও তথ্য প্রযুক্তির কুফল থেকে নিজেরা এবং ভবিষৎ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য সম্ভব সকল আহমদীর বাসা-বাড়ীতে এম.টি.এ সংযোগ নিতে বিনীত অনুরোধ করছি। কারণ সন্তানদের দুনিয়াবী শিক্ষা দেয়ার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করছি সেসাথে যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে সম্পর্ক করতে এম.টি.এ. নিতে আরো কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয় তবুও তা করা একান্ত আবশ্যক। এর ফলে এম.টি.এ. পরিবারকে আল্লাহ্তাআলা হেফাযত করবেন, ইনশাআল্লাহ্।

২। **তাহ্রীকে জাদীদ ঃ** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী সকল স্থানীয় জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট, মুরব্বী সিলসিলাহ্, মোয়াল্লেম এবং সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রত্যেক আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত, নও মুবায়েঈন এবং সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদেরকে ২০০৩-২০০৪ইং সালের তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদায় ওয়াদা করাবেন। চাঁদা কে কত টাকা ওয়াদা করেছে সেটি মূখ্য নয়, চাঁদা কম দিয়ে হলেও যেন সকলকে এ মোবারক তাহ্রীকে সামিল করেন সেজন্য সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কাম্য। এই ওয়াদার চাঁদা অক্টোবর, ২০০৪ইং এর মধ্যে আদায় করে আদায়কারীর নামের তালিখা ১৫ অক্টোবরের ২০০৪ এর মধ্যে মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে পাঠাবেন যাতে আমরা ২০ অক্টোবরের মধ্যে বিশেষ দোয়ার জন্য হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে তালিকা পাঠাতে পারি।

উপরোক্ত বিশেষ এলানটি মাঝে মাঝে মসজিদে এবং হালকা মিটিংগুলিতে অবগত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খাকসার যেন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারি সেজন্য সকলের নিকট খাস দোয়া কামনা করি।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহ্রীক জাদীদ

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

আল্লাহ্র অশেষ দয়া ও মেহেরবানি এবং জামাতের সদস্যদের খাস দোয়ার বরকতে আমাদের একমাত্র মেয়ে নাজ আফরীন সুলতানা এবার ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল ও কলেজ থেকে এস, এস, সি পরীক্ষা দিয়ে GPA-5 পয়েন্ট পেয়ে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। তার জন্য আমরা জামাতের সকলের ও মহান স্রষ্টার প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তিনি যেন ভবিষ্যতে তাকে আরো অধিক সফলতা ও উন্নতি দান করেন আর জামাতের খেদমত দানে সক্ষম হয়, এই দোয়া কামনা করি, আমীন।

শফিক আহমদ ও মরিয়ম সুলতানা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

☐ আমার মেয়ে আলিয়া রিফ্ফাত এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় আল্লাহ্তাআলার ফযলে জিপিএ-৪.০৬ পেয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। জামাতের সকলের কাছে আমি দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ্তাআলা তাকে উচ্চ শিক্ষা লাভের পাশাপাশি জামাতের সেবা করার তৌফীক দান করেন, আমীন।

মাহবুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশাআত

☐ আমি মোহাম্মদ সারেফিন জামান, পিতা-মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় আল্লাহ্তাআলার ফযলে জিপিএ-৫ পেয়েছি, আল্হামদুলিল্লাহ্। জামাতের সকলের কাছে আমি দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ্তাআলা আমাকে উচ্চ শিক্ষা লাভের পাশাপাশি জামাতের সেবা করার তৌফীক দান করেন, আমীন।

মোহাম্মদ সারেফিন জামান
গোড়ান, ঢাকা

☐ আমি শরীফ মোহাম্মদ সাঈদ পিতা-মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, বকশিগঞ্জ জামাত, চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে জিপিএ-৪.৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্। জামাতের সকলের কাছে আমি দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ্তাআলা আমাকে আরো সফলতার সাথে উচ্চ শিক্ষা লাভের পাশাপাশি এই ঐশী জামাতের সেবা করার তৌফীক দান করেন, আমীন।

শরীফ মোহাম্মদ সাঈদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বকশীগঞ্জ

☐ আমার মেয়ে মোছাম্মাৎ নুসরাত জাহান মুক্তা চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় আল্লাহ্তাআলার খাস ফযলে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫(এ+) পেয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট আমি বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্তাআলা যেন তাকে পরবর্তী ধাপগুলো পূর্ণ সফলতার সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে জামাতে নিয়ে জামাতে আহমদীয়ার কল্যাণমূলক কাজ করার সৌভাগ্য দান করেন।

মোঃ আব্দুল করিম
সৈয়দপুর জামাত, নীলফামারী

☐ আমি মোছাম্মাৎ নাসিরুর রহমান ইনাব চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় আল্লাহ্তাআলার অশেষ সাহায্যে জিপিএ-৫ (এ+) পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্। জামাতের সকলের কাছে আমি দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ্তাআলা আমাকে এই ঐশী জামাতের সেবা করার তৌফীক দান করেন, আমীন।

মোছাঃ নাসিরুর রহমান ইনাব
ওয়াকফে নও নং-১৬৭৩-বি, সৈয়দপুর জামাত

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশাআত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকসি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মুদ্রিত
Printed and Published by Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211